KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর [illegible]
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৩৭/?	Year of Publication : শ্রাবণ - পৌষ ১৩৮৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
প্রতিষ্ঠিত
ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রাবণ-পৌষ
১৩৮৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সংবেদন

শেষ পর্যন্ত চতুরঙ্গ পত্রিকার কর্ণধার আতাউর রহমানও মারা গেলেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আগেই গত হয়েছিলেন। কবির সাহেবের পর সম্পাদক হয়েছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। ডি কে-ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন, চলে গেলেন অকালে। তারপর এই বিপর্যয়।

আতাউর রহমান নামে অবশ্য কোনোদিন চতুরঙ্গের সম্পাদক ছিলেন না। নামে মাত্র মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন। অথচ আমরা সবাই জানি চতুরঙ্গের অপর নাম আতাউর রহমান, চতুরঙ্গ মনে করলেই আতাউর, আতাউর ভাবলেই চতুরঙ্গ।

সেই আতাউর নেই অথচ চতুরঙ্গ চলছে—এ অবস্থা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও চতুরঙ্গ নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। 'আপনি নিজে প্রেসে যান, না হলে হবে না'—একথা আমায় তিনি তখনই বলেছেন যখন কোনোমতেই তাঁর পক্ষে ছাপাখানায় ছোটা সম্ভব ছিল না।

রহমান ইদানীং মাঝে মাঝে বলতেন, চাল্লিশ বছর হতে চলল আর চতুরঙ্গ চালিয়ে কী হবে, বন্ধ করে দেওয়া যায়, আপনি কী বলেন? মনোমত লেখা না পেয়ে এলিয়টের 'দি ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল; পরে আবার সেই লুপ্ত পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করল—এমন আলোচনাও এ প্রসঙ্গে হয়েছিল, মনে পড়ছে। বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন ও সবুজপত্রও তো সেই পর্যায়েই পড়ে।

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যাটি যখন যন্ত্রস্থ সেই অবস্থায় আতাউর মারা যান। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যেত যদি না শ্রীমতী নীরা রহমান উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসতেন প্রকাশনার কাজে সহায়তা করতে। চতুরঙ্গ যেন বন্ধ না হয় ও নিয়মিত প্রকাশিত হয়, এ পরামর্শও যেমন অনেকে দিয়েছেন আবার তর্জনী-সংকেতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন কেউ কেউ, ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকাটি যদি আপনার হাতে সম্ভ্রম হারায় তো জানবেন আতাউরের দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটল।

অনতিক্রম্য বাধা-বিপত্তির জন্য চতুরঙ্গ প্রকাশে যে নিরতিশয় বিলম্ব ঘটল তার জন্য শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহক-অনুগ্রাহকরা অবশ্য বিবেচনায় মার্জনা করবেন, আশা করি। এই অনিবার্য কারণেই শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ সংখ্যা দুটি একত্রে যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
সম্পাদক, চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৯ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৪

সূচিপত্র

কার্তিক লাহিড়ী । জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' ৯৭
কৃষ্ণ ধর । বাতিঘর ১০৪
নারায়ণ চৌধুরী । সুরসাধক ভীষ্মদেব ১১৫
সুধাংশু ঘোষ । অবারিত ১২২
অসীম রায় । মনে পড়ে আলফান্সো ১২৭
রণেশ্বর হাজরা । আবহমান ১২৯
বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । যে পাত্রে বিষ ১৩০
সজল বন্দ্যোপাধ্যায় । সুখের সময় ১৩১
শওকত ওসমান । পতঙ্গ-পিঞ্জর ১৩২
আলোচনা । তপন রায়চৌধুরী, পুণ্যশ্লোক রায়, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা রায়, অসীম রায়, সুকুমার সেন ১৫৮
সমালোচনা । শওকত ওসমান, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ধ্রুব দাশগুপ্ত, হিতেশরঞ্জন সান্যাল ১৭২

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রে আন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

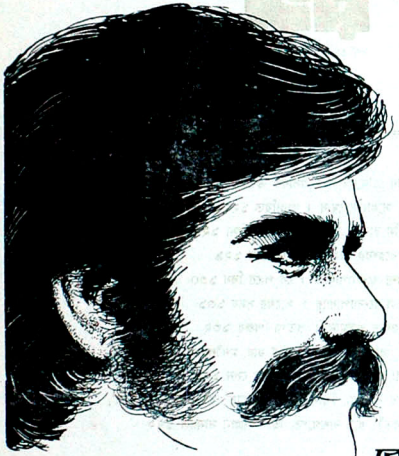

দাড়ি আপনাকে কামাতেই হবে

তা আপনি যতই ক্লান্ত বিরক্ত আর আলস্য বোধ করুননা কেন ! কাজটা সহজ সুন্দর এবং মোলায়েম হয়ে যায় যদি রাত্তিরে শোবার সময় বোরোলীন মেখে শুতে যান । দাড়ি কামাবার পর আবার মুখে মেখে নিন বোরোলীন—সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম ।

বোরোলীন ত্বককে করে তোলে নরম ও শান্ত । তাছাড়া হঠাৎ কেটে গেলে বা ছড়ে গেলেও ভয় নেই । বোরোলীন নিরাময়ী । বোরোলীন জীবাণু নাশক । এমন কি ফুসকুড়ি, ব্রণ—ইত্যাদির উৎপাতও জব্দ তার কাছে । সুতরাং দাড়ি কামাবার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলুন আগে পরে নিয়মিত ভাবে বোরোলীন ব্যবহারের অভ্যাস ।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বর্ষ ৩৯ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৪

জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান'

কার্তিক লাহিড়ী

কবিতা লেখার আবেগ আর উপকরণের সঙ্গে উপন্যাস লেখার আবেগ আর উপকরণের নিশ্চয় তফাত আছে, না হলে একজন আদ্যন্ত কবির উপন্যাস দেখে আমরা চমৎকৃত হই কেন, বা একজন নিছক ঔপন্যাসিকের কবিতায়। উপরন্তু সেই কবি যদি এমন উপন্যাস লেখেন, যা দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাকর্ষক না হয়ে পাঠকের মনে এক অনুত্তাল অথচ অমোঘ উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তবে মর্মে মর্মে টের পাই তিনি কবি হলেও জাত ঔপন্যাসিক নিশ্চিতভাবে। জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' পড়ে তেমন সিদ্ধান্ত টানা প্রায় দুর্নিবার। "ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তো ঘোচেনি," (পত্রাংশ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ময়ূখ, পৃ ২২৮)—মনের কোনো গহন কন্দরে সামান্য ইচ্ছাটুকু 'মাল্যবান'-এর মতো উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট অপ্রতিরোধ্য কারণ হতে পারে কিনা, তা মনোবিজ্ঞানী বা অন্য কোনো যোগ্য লোকের আলোচ্য বিষয়, আমরা শুধু এই ভেবে আলোড়িত যে, বাংলা উপন্যাসের উষর ভূমিতে "মাল্যবান' মহার্ঘ শস্যবিশেষ।

অথচ 'মাল্যবান'-এর পটভূমি বিপুল নয়, সময়সীমাও সংক্ষিপ্ত, এমনকি অগণন মানুষের ভিড় যে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আনে, তার শোচনীয় অনটন ও তৎসহ দার্শনিক প্রস্থানের অভাব প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। মাত্র একটি পুরুষ আর মহিলার, বস্তুত একজন পুরুষের অন্তরবিলোড়নের কাহিনী হচ্ছে উপন্যাসটির উপজীব্য, যদিও নায়ক মাল্যবান সমাজের কেউকেটা নয়, বটমালি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের সামান্য চাকরের যার "পনেরো বছর চাকরির পর গত মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে হয়েছে," তবু তাকে নিছক কেরানী বা অফিসবাবু ভাবা মুশকিল, কারণ "একটা কথা ঠিক : মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়; এক জোড়া রেশমী স্টকিঙ, বার্নিশকরা নিউকাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেটকেস ও ফুটবল গ্রাউন্ডের বেঞ্চি দিয়ে নিজেকে চোখঠার দিতে সে ভালবাসে না। এইসবের চেয়ে সে আলাদা।" অবশ্য "মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সে করেছে এর চেয়ে খুব বেশী ভালো-কিছু কোনোদিনই সে করতে পারে না;" কিন্তু তা বুঝেও মনের আকাঙ্ক্ষা দমিত হয়নি তার মুহূর্তের জন্য, ছাই-চাপা আগুনের মতো তা নিরীহভাবে থেকে গেছে এইমাত্র—

"অনেক জিনিস চেয়েছিল সে : বিদ্যা সবচেয়ে আগে : অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার

সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজের মনটা যে নেহাৎ কেরানীর ডেস্কে-আঁটা নিরেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা।" হয়তো ঐসব চাওয়া আর ইচ্ছা—ইংরেজী শিক্ষিত, মধ্যবিত্তের একান্ত আপনার, এরই ফলে অর্থাৎ সাধ আর সাধ্যের দ্বন্দ্বে কিংবা নিজের বাস্তব অবস্থা আর চাওয়া-পাওয়ার নিরন্তর টানাপোড়েনে শতধা দীর্ণ হওয়াই মধ্যবিত্তের ভবিতব্য, মাল্যবান তেমন মধ্যবিত্তর প্রতিভূস্থানীয় সংগতভাবে।

কিন্তু মাল্যবান দুঃখীও বটে, একই সংসারে থেকেও সে স্ত্রী-পরিত্যক্ত এবং তার প্রতি উৎপলার ব্যবহার যে-কোনো মানদণ্ডে অভদ্রোচিতই শুধু নয়, সময় সময় নিষ্করুণার সীমা ছাড়ায়; তবু এই নিষ্ফলা সম্পর্ক আমৃত্যু টেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই মাল্যবানের। আর যতই সে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়, উৎপলার অপ্রেম ততই দারুণভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ উগ্র হয়ে ধ্বস্ত করে তার অস্তিত্ব, মাল্যবানের জীবনের নিঃশস্ততার অর্থ যে তার বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই মূল বিষয়টিও নস্যাৎ করতে উৎপলার বিদগ্ধমাত্র বুক কাঁপে না, সে অবলীলায় বলে—(ক) "লোচন ভোমেরও জামাইষষ্ঠী হয়—সেইরকম আর কি। বেয়াল্লিশটা বছর সেত এত বড়ো পৃথিবীর ভেতর থেকে মানুষ সমাজে মানুষটা কানা—'একেবারে ছুঁচো চামচিকের পারা—' ... 'কোথাও কোনো ডাক নেই, কেউ পোঁছে না, হৈ হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা মজলিশ নেই—খোল করতাল কেত্তন মুজরোর বালাই নেই—কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না। কিন্তু বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে? ডাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে'।" (খ) "সেই বিয়ের পর থেকে দেখছি কেরানীবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে দু'টো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন।" ইত্যাদি আরও অসংখ্য সংলাপে উৎপলার অমানুষী নিষ্প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে, যেন পলা স্ত্রী নয়, মাল্যবানের অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগের পাশে নিরেট অপ্রেম। এমন বৈপরীত্যে স্থাপিত চরিত্র দুটি অনায়াসে লোমহর্ষক কাহিনীর কিংবা ভাবালুতার বেনোজল বইয়ে দিতে পারত, 'মাল্যবান'-এ লেখক কিছু অ-মনস্ক হলে সে সম্ভাবনা রোধ করা শিবেরও অসাধ্য ছিল, কারণ আপন স্ত্রী অবহেলিত নায়কের পক্ষে নিরতিশয় অভিমানাহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সেই অভিমানে বুদ্ধিবৃদ্ধি প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে বলে নায়কের কিছু অতিনাটকীয় আচরণ বা কাজে গোটা সমস্যার সংহতি ও ঘনতা তরল হতে নিমেষমাত্রেরই দরকার হত, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের প্রখর সচেতনতা আর সংযম উপন্যাসটিকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে, যার জন্য 'মাল্যবান' পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবি করে।

২

"অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা serenity জিনিসটায় খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিংবা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না।" (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দর চিঠি, ঐ, পৃ. ২১৬-১৭)

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দর চিঠিতে তবু তাঁর সৃষ্টিকৃতি অনেকখানি আঁচ করা যায়, যদিও স্বীকার্য ঐ চিঠিতে প্রসারিত ভাবনাচিন্তা তাঁর রচনা-বিচারের একমাত্র নিরিখ হতে পারে না, কারণ জীবনানন্দর ভাবনাচিন্তা নিশ্চিতভাবে সময়ের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়েছে, এক সময়ের ধারণা অন্য সময়ে স্থির থাকেনি—হয়তো তা আমূল বদলেছে, নয়ত ঐ ধারণাই গভীরে শিকড় চারিয়েছে, তাই উপরি-উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে তাঁর শিল্পকর্মের বিচার খণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের চরিত্রে আশ্চর্য এক সংগতি দেখা যায়, যে-কোনো ব্যক্তির চরিত্র (সৎ বা অসৎ যে কোনো ব্যক্তি) তার সামগ্রিক জীবনধারার সংগে সামঞ্জস্য রেখে চলে, তা তিনি যতই পরিবর্তিত হোন না কেন, যদিও মতটি সরলভাবে মেনে নিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, বরং একজনের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করেই তবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে, সেক্ষেত্রে আমাদের বর্ণিত বিষয়টি অসত্য বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের রচনাবলীতে আনন্দের চেয়ে অশান্তির তাড়না রয়েছে নিঃসন্দিগ্ধভাবে, কারণ তিনি সমকালীন সমাজ, সংসার বা জগৎকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে চাননি বা এড়াতে পারেননি, আর সেই সমসাময়িক জীবনের গ্লানি তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। হয়ত কবি-জীবনের প্রথম দিকে তাঁর প্রেরণা অনেকখানি নিয়োজিত ছিল নিসর্গের অনুধ্যানে, কিংবা কেবল স্বপ্নময় জগতে সাযুজ্য স্থাপনের লীন হবার প্রয়াসে, তবু তখনি সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়ে রচিত অনুকারী কবিতায় বা ধ্বসের জগতে প্রস্থানের বাসনায় তাঁর বস্তুচেতনা মোটেই অনুপস্থিত নেই, এবং তা ক্রমে অভিজ্ঞতা বাড়ার সংগে সংগে আর শিল্পকর্মের অগ্রগতির ধারায় স্পষ্ট সাবয়ব হয়ে ওঠে। আর যতই দিন যায়, সমসাময়িক জীবনের জটিল আবিলতা এই সংবেদ কবিকে অস্থির করে তোলে, "ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি" জেনেও ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়া সৎ লেখকের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, কান টানলে মাথা আসার মতোই ইতিহাস পরখ করতে গেলে সমাজ, সমসাময়িক কাল বা জীবন হাজির হয় বিনা নোটিশে।

"বাস্তবের রক্ততট" তাঁরই ব্যবহৃত শব্দ (নীলিমা, ঝরা পালক); বাস্তবের তটে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া যেন গত্যন্তর নেই; বাস্তবের অসহ চাপে কবি কেবল বিষজর্জর অন্ধকার দেখতে পেয়েছেন, তাই সামগ্রিকভাবে হলেও তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, এবং তা গোপন করেননি এইসব পঙ্‌ক্তিগুলিতে : আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে ভরে গিয়েছে;/সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী যেন কোটি কোটি শয়োরের আর্তনাদে/উৎসব শুরু করেছে/ হায় উৎসব!' (অন্ধকার)। এই তিক্ততার অন্তঃস্থলে অবশ্যই কাজ করে চলে অতি সংগোপনে তিমিরহননের গান, জীবন-আস্বাদনের গভীর প্রত্যয়, কিন্তু সেই সুর বোধ করি আরও কিছু পরে স্পষ্ট হয় তাঁর কবিতায়, ততদিনে তিনি প্রাক্‌বিশ্বযুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধের অবনয়নে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আর অমানুষী প্রতিবেশ লক্ষ্য ক'রে মনে মনে বিরক্ত আর ধ্বস্ত হয়ে অবশেষে যে বেদনা বোধ করেন, সেখানে রাবীন্দ্রিক প্রশান্তি আশা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি তার কিছু আগের লেখা হলেও জীবনানন্দ তখনও অশান্তিকে, আগুনকে সর্বৈব না ভাবলেও তা যে তুচ্ছ নয় এমন অনুভাবিত ছিলেন। 'মাল্যবান' সেই অশান্তি আর আগুনের শীর্ষে রচিত কাহিনী নিঃসন্দেহে, যদিও তার মর্মে রয়েছে সংগুপ্তভাবে প্রশান্তির জন্য ব্যাকুলতা।

মাল্যবান আর উৎপলার, বিশেষত মাল্যবানের অন্তর্লোক উন্মোচনে ঘটনার ঘনঘটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে বহির্ঘটনার স্থান তার নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় বরং তার থোড়-বড়ি-খাড়া জীবনের তুলনায় নেহাত তুচ্ছ, একেবারে শূন্যের কোঠায়; এর মধ্যে যেটুকু ঘটনার চাপ থাকে, তাতে নাটকীয়তার চেয়ে অতিনাটকীয়তা রঞ্জিত হয়ে থাকে বেশি। বহি-

ঘটনার চাপ আলোচ্য উপন্যাসে কম, মালাবানের মতো লোক নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাই তার উপর বাইরের ভারও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে না; উপরন্তু মালাবান "শান্তি ভালবাসে : নিজের সঙ্গে সংবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও।" এবং সে নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব; তার জীবনের নিঃশব্দতার যে সূক্ষ্ম মানে আছে সেই সূক্ষ্মতার আভাস তবু পাওয়া যায় ছাঁড় হাতে পার্কে ঘোরার সময় স্বপ্ন দেখায়, তৎক্ষণে সে কেরানীর ডেস্ক আর উৎপলার স্বামিত্ব থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নেয় কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু "তারপর অবসন্ন হয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, একটা চুরুট জ্বালায়; ক্ষিদে পায়; বাড়িতে ফিরে আসে।" অর্থাৎ একজন নিরীহ নির্বিরোধ বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-ভঙ্গের আলেখ্য তার চেতন-অবচেতন জাগর-সুষুপ্তির বা জাগর স্বপ্নের চলচ্ছিত্র বিশ্বিত হয় অ-নাটকীয় খুব সহজ ভঙ্গিময়। মধ্যে মধ্যে নাটকীয়তার যে অবকাশ নেই এমন নয়, বিশেষত মালাবানের শীতের রাতে নীচতলার ঘর থেকে দোতলায় পলার ঘরে উঠে আসার পর তার সঙ্গে পলার কথোপকথনে ক্ষণিক হলেও সে আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তবু তা প্রকৃত নাটকীয় হয় না এজন্য যে তার আগেই পাঠক প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং জানে যে নায়কের এভাবে স্ত্রীর ঘরে উঠে আসার পরিণাম কী। তাই সংঘাত আর চমক নাটকের যে প্রাণ, সেই প্রাণময় কৌশলটির রহস্য আগেই উন্মোচিত করে দিয়ে নাটকীয়তা পরিহার করা হয় সহজভাবে, অথচ এই নিষ্ঠুর স্বাভাবিকতার মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বিষয় বা সমাজ-জিজ্ঞাসা তুমুল হৈ চৈ তোলে না। অযথা তবু প্রেমের নিষ্ফলতার বা চরম নির্মমতার মর্মে মর্মে দুটি ভিন্ন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যায় আপন মনে, তা অবশ্য নিবিষ্ট পাঠে বুঝতে হয়।

উপন্যাসে উৎপলার প্রেমে অ-ব্যাখ্যাত থেকেছে, মালাবানও প্রেমের উৎস সন্ধান করেনি; সে প্রেম-কে মেনে নিয়েছে—"কোথায় পেলো সে এ-ধারণা? কে শিক্ষা দিয়েছে তাকে? প্রেম হয়ত প্রেমেই শিখিয়েছে উৎপলাকে।" কিংবা "উৎপলার উদাসীনতা ঠিক নয়, খুব সম্ভব প্রেম—দিনের পর দিন স্বচ্ছ হয়ে আসছে যেন", অথচ উৎপলা দাম্পত্য জীবনের শুরুতে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় স্বামীর জন্য, মালাবানের ভাবনাচিন্তায় সে কথা একসময় বেরিয়েও পড়ে। যতদূর মনে হয় উৎপলা প্রথম থেকেই মালাবানের সুপ্ত অধিকারী-মনোবৃত্তি সম্পর্কে সংশয়িত ছিল, সেই সংশয় ক্রমে তিক্ত বিরক্ত হয়ে শেষে প্রেমে রূপ নেয়। আসলে উৎপলা স্বামীর সুপ্ত অথচ দৃঢ়প্রোথিত সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গি সহ্য করতে পারে না, যদিও তার মনেও দ্বিধা আছে হিন্দুর মেয়ে বলে, তবু "এ বিয়ে আমার হতো" বিশ্বাসটি যে সত্য নয়, তা সংস্কার,—তা কবুল করে অকপটে। মালাবান পলার আচার-ব্যবহারে নিয়ত আহত হয়েও সে উৎপলার মনোভাব বোঝে না বলে বার বার সন্ধির উদ্দেশ্যে ফিরে ফিরে আসে, এবং সে চেষ্টা বিফল হওয়ার জন্যই সে স্পর্শকাতর ভাবালু হয়ে ওঠে।

মালাবান পাড়াগাঁয়ে জন্মেছিল, তার স্মৃতি তাকে প্রায়ই উত্তেজিত সম্মোহিত করে, এর সঙ্গে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তা কিছুতেই পূরিত হয় না, আর এই ফাঁক ভরাট করার জন্য যে জায়গাটুকুর দরকার ছিল তা একসময় তার চোখের সামনে কিন্তু তার অচেতনে সরে গেছে, তাই সে বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি হয়। এই রকম ভয়ংকর শূন্যের মুখো-মুখি এসেই হয়তো সে চিন্তা করে—"একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু ভীরু বৌ যদি সে পেত, তাহলে এ-দুটি সাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দান না রেখে শান্তভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, নম্রবন্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুনে খড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনীর মতো হল মালাবানের বিয়ে আর বৌ আর বিবাহিত জীবন।" মালাবানের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তা তার অন্যান্য চিন্তাভাবনাতেও প্রকট, সেইসব চিন্তা নির্ভেজাল মধ্যবিত্তীয় তা বলা বাহুল্য। নিবিষ্টভাবে

উপন্যাসটি পাঠ করলে নায়কের যে দুঃখবোধ আমাদের আলোড়িত করে, তা প্রায় প্রতিটি অ-সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারের আলেখ্য, যদিও তার প্রকাশ একরকম নয়, এবং দুঃখবিলাস লালনেরও বোধহয় কোনও সুখকর দিক আছে। যে-সব বৈশিষ্ট্য একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে পাওয়া যায় তার সবকটি মালাবানে বর্তমান :

"গোলদীঘিতে ঘুরে ঘুরে বারো চোদ্দ বছর সে অনেক হাওয়াই ফসল ফলিয়ে গেছে; সমাজ-সেবা, দেশ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা, বিপ্লবের তাড়না—তেজ, নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা, উনিশ শতকের নিশায়মান সমুদ্রতীর : সাহিত্যের ধর্মের মননের; বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্তরোচ ছায়া, জ্বালা সমুদ্র সংগীত—নানারকম অপর রকম জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ঈর্ষা করেছে—নিজের জীবনটাকে অনেক সময় অসার ও নিষ্ফল মনে হয়েছে তার। কিন্তু তবুও এই পাকা চাকরিটুকু, স্ত্রী ও মেয়ে, কলেজ স্ট্রীটের ঘর তিনখানা : এর চেয়ে অন্য কোনো সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি?"

স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী বোধকরি নিরেট মধ্যবিত্তের ইতিহাস, মালাবান তার ব্যতিক্রম নয়, আর আমাদের মধ্যবিত্ত-র ধরন-ধারন বিশুদ্ধ নাগরিক নয়, তা বলা বাহুল্য—একই সঙ্গে প্রগতি আর প্রত্যাগতির মিলন তৎসহ ভাবালুতা স্মৃতিকাতরতা। না হলে পলাকে অপ্রেমে নিরঙ্কুশ জেনেও সম্পর্কশূন্য হওয়ার সীমা পেরিয়ে গিয়েও সে বোঝে "উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবু চলতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত—" এই অসহায়তা মধ্যবিত্তের ট্র্যাজিডি-ও বটে। বন্ধন ছিন্ন করার যে শক্তি, উদ্যম বা বোধ দরকার মধ্যবিত্ত জীবনে তার অনটন এইজন্য যে সে তার অতীতকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না, চেষ্টা করেও হয়তো পারে না। তাই মালাবানের মতো আমাদের আশা-ভঙ্গের কাহিনীতে দুঃখবোধের লালন এত প্রকট হয় ওঠে, এবং মনস্ক ঔপন্যাসিক না হলে এমন কাহিনী যে ভাবালুতার আবর্জনা সৃষ্টি করে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যে।

'মালাবান' যে আবর্জনার স্তূপে বাড়ায়নি, তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই ঔপন্যাসিকের প্রখর সচেতনতা, যে চেতনা জীবনকে হেলাফেলাভাবে দেখে না, যে চেতনায় নিহিত থাকে "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।" কিংবা "কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণ-মানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা—সকলেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট করে, আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সং কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়, অভিজ্ঞতার আঘাতে আর সংস্পর্শে উজ্জ্বল, গভীর ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতি অ-মানবিক কাণ্ডগুলি জীবনানন্দকে সমাজনিরপেক্ষ হতে দেয়নি—প্রকৃতিজগৎ থেকে মানবিক জগতে পদার্পণ আর পরে সেই জগৎ সম্পর্কে আশ্চেতন হয়েছিল বলেই 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনবদ্য কবিতাগুলি আমাদের কেমন নাড়া দেয়। তার মানে এই নয় যে এর আগে অনবদ্য কবিতা রচিত হয়নি। বলা উদ্দেশ্য এই যে, কবি ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় বিশ্বাস-কে আয়ত্তে আনতে পারছিলেন, তাই কবিতাগুলি ক্রমে ভিন্ন স্বাদের অথচ গভীর জীবনবোধে উদ্ভাসিত হতে থাকে। 'মালাবান' (রচনাকাল জুন ১৯৪৮ রূপে

উল্লিখিত) সেইসব সময় রচিত, বস্তুত কবিতার সোদর না হয়ে নির্মম অকাব্যিক হয়ে ওঠে।

অথচ 'মাল্যবান'-এ কাব্যিক আমেজ মোটেই উপেক্ষিত নয়, ঐ আমেজ অনেক সময় প্রসারিত নিবিড়ভাবে, তবু উপন্যাসটিকে জীবনানন্দীয় কাব্যের সম্পূরক এবং দোসর বলা চলে না। কবি তাঁর কাব্যপ্রত্যয় বিসর্জন দেননি এখানে, কিন্তু উপন্যাসের দায় যে আরও প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কাব্যের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ আর ওতপ্রোত, সেকথা বইটি পাঠ করলে বোঝা যায়। এই নিষ্করুণ নাট্যে তাই স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ মনোহর হয়ে ওঠে না বা কথার মারপ্যাঁচে সম্পর্কের জটিলতা হারিয়ে যায় না। অন্যদিকে নায়কের অন্তর্লীন চিন্তাভাবনা মুখ্য হয়ে উঠলেও সচরাচর অন্যান্য অন্তর্মুখী উপন্যাসে যেমন নায়কের বাগ্‌বিদগ্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ চিন্তন মনন প্রকট হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, এবং এখানে লেখককে আমরা শিরোপা দিতে বাধ্য। নায়কের স্বপ্ন জাগর কল্পনা অভিমান বাস্তব সম্পর্কে কখনো কখনো অযৌক্তিক মনোভাব—এককথায় পরা-বাস্তবতার স্বরূপ সম্যক স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও ভাষার ব্যবহার এমন সঠিক হয় যে, আমরা মাল্যবানকে তার আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মনাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিপন্ন মনে করি; যার স্বরূপ বোধহয় এই : "অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে;"/আর বিপন্নতার সঙ্গে মিশে থাকে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা নির্বান্ধবতা অসহায়তার দুঃসহ ভার, তাই এমন নায়কের আত্মরোমন্থনের ভাষায় পরাবাস্তবতার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেই ভাষার সুষ্ঠু আর সীমিত প্রয়োগ উপন্যাসটির সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি—সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়, যদিও তারই পাশাপাশি প্রাত্যাহিক জগতে ব্যবহৃত ভাষাও নিজের আসন পাকা করে নেয়। অর্থাৎ জীবনানন্দ উপন্যাস রচনা করতে নিছক কাব্যিক তাড়নার বশবর্তী হননি, অবশ্য কিছু কিছু বাক্‌প্রতিমা নিশ্চিতভাবে কাব্যিক এবং কখনো কখনো বর্ণনার ভাষাও; তবু ঐ কাব্যিক আবহাওয়ার মধ্যে সহজ ঘরোয়া ভাষা দেশজ শব্দ শ্লীল অশ্লীল তাবৎ বাকভঙ্গি ঠাঁই করে নেয়; সংলাপে তো বটেই, এমনকি মনোবিশ্লেষণে তা সমানভাবে মেলে, অথচ উপন্যাসের গোটা ছক লেখকের আয়ত্তে থাকে বলে 'মাল্যবান' সীমিত পরিসরে বিরাট জীবনদর্শন বহন না করেও অসামান্য উপন্যাস হয়ে ওঠে।

৩

"সমস্ত সুখী পরিবার মোটামুটি এক রকমের, প্রতিটি অসুখী পরিবার তার বিশেষ ধরনে অসুখী"—'অ্যানা কারেনিনা' উপন্যাসের প্রারম্ভিক বাক্যটি 'মাল্যবান' রচনার সময় লেখকের স্মরণে এসেছিল কিনা বলা দুষ্কর, এবং এসে থাকলে বা না থাকলে আমাদের বিচার তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, কিন্তু বাক্যটি যে অসম্ভব রকমের খাঁটি তা প্রায় প্রত্যেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানা আছে। অ-সুখী পরিবার বিশেষ ধরনে অসুখী বলেই মাল্যবান মধ্যবিত্তের প্রতিভূস্থানীয় হয়েও তার পারিবারিক কাহিনী অন্যরকম হয়ে যায়, যেমন 'চোখের বালি' বা 'যোগাযোগ' অসুখী পরিবারের কাহিনী হয়েও দুটি দুরকম ভাবে অনবদ্য। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এর কথা মনে পড়ে, যদিও স্বীকার্য গল্পটিতে অশান্তির আগুন কেমন এক ভাববিহ্বল আবেগে অনেকখানি স্নিগ্ধ হয়ে গেছে।

'মাল্যবান'-এ উৎপলা অনুপমকে বিয়ে করতে পারত অথচ বিয়ে হয়েছে মাল্যবানের সঙ্গে, তেমনিভাবে দেখি 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এ সোমেন শচীকে ভালোবাসলেও শচীর বিয়ে হয়েছে তার বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে, আর বহুদিন বাদে অতর্কিতে দেখার সামান্য ঘটনা দিয়ে গল্পের শুরু। ঐ

গল্পের পরিসর বিস্তৃত হলে হয়তো 'মাল্যবান'-এর সমপর্যায়ের না হলেও প্রায় ঐ-রকম আগুনের সাক্ষাৎ পেতাম সন্দেহ নেই। হয়তো গল্প বলেই সেখানে কাব্যিক সংহতি খানিকটা রোমান্টিকতার স্পর্শে গল্পটিকে উপন্যাসের মতো ভয়ংকর করে তোলেনি, করে তুললেও দুটি যে দু-রকম হত তা উভয় রচনা পাঠ করলে বোঝা যায়, যেমন নিষ্ঠুরতা 'বিলাস' গল্পের উপসংহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মাল্যবান' উপন্যাসের বিশেষত্ব এইখানে যে উপন্যাসটি একই সঙ্গে বিশেষ ও নির্বিশেষ হয়ে ওঠে; বিশেষ, কারণ তা বিশেষ অসুখী পরিবারের কাহিনী, যার পাত্র-পাত্রীর আচরণ ঠিক সেই ন্যায় মেনে চলেছে যে ন্যায়ে চ'লে উপন্যাসটি সমাজ আর আত্মানুসন্ধানের নিরিখ হয়ে ওঠে। তবু 'বিলাস' গল্পে যে নিহিত শ্লেষ থাকে তার অভাব উপন্যাসটিতে কিছুটা বর্তমান, বিলাস কথাটির যে দুটি অর্থ (এক : "কাছে এনে রেখেছিলে? কিন্তু পড়লে না? কেমন উম্বায়ী তোমার আত্মা।" ..."না, তা নয়—' মাস্টারমশাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'তবে বিলাসী।" দুই : "তিনি আমাকে বলতেন, তুমি সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে হবে কি, তোমার মনে কোন বিলাস নেই, সর্বেন।' ...'জেঠামশাইয়ের মতে বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম্ হয়ে থাকা।") জীবন সম্পর্কে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত তা বিচারের চেষ্টা ঐ গল্পে দেখা যায়, তেমন চেষ্টা 'মাল্যবান'-এ অনুপস্থিত, কিন্তু ঐ গল্পের অনেক অভাবই উপন্যাসে উপস্থিত থাকে বলে 'মাল্যবান' এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মাল্যবানের জীবন নানা বৈপরীত্যের সমাহার হলেও, তার পিছুটান থাকলেও স্ত্রীর অপমান, নিষ্ঠুর ব্যবহার, স্ত্রীর কাছে আগতদের প্রতি অসহ ঘৃণা বা ঈর্ষা, নিঃসঙ্গতা, নিজের আশাভঙ্গ ইত্যাদির অশান্তির আগুন ছাড়িয়ে যে প্রশান্তির জন্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তার স্বপ্নের মধ্যে, তেমন প্রত্যাশা গল্পগুলিতে নেই, এমনকি সেই প্রত্যাশা বাংলা সাহিত্যের ক'টি উপন্যাসে পাওয়া যায়, তা বিবেচক পাঠকমাত্রই জানেন, এবং এইখানেই 'মাল্যবান' অসাধারণ উপন্যাস হয়ে ওঠে; কারণ সে প্রত্যাশা মামুলি নয়, জীবনবোধের গভীরে শিকড় চারায় বলে 'মাল্যবান'—সেই তাৎপর্যে তুলনা চলে শিল্পসাহিত্যের অন্য এক বিভাগে অ-সুখী পরিবারের কাহিনী নিয়ে রচিত চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য ছবি 'চারুলতা'-র সঙ্গে। 'চারুলতা'-য় অবশ্য অশান্তি বা আগুনের আঁচ দাউ দাউ নয় পরিচালকের পরিমিতবোধের নিদারুণ গুণে, যদিও তা টের পাওয়া যায়, কিন্তু 'মাল্যবান'-এ আগুনের আঁচ বেশ বোধ করা যায়। বোধহয় মাধ্যমের ভিন্নতা এবং সুবিধা-অসুবিধার তারতম্যে 'চারুলতা'-য় যতদূর নৈর্ব্যক্তিক হওয়া গিয়েছে ততখানি 'মাল্যবান'-এ সম্ভব হয়নি, তাই উভয়ের হুবহু তুলনা করা সমীচীন নয়, আমরা শুধু উভয় স্রষ্টার কাজের মধ্যে মিল খুঁজে পাই ব'লে এই তুলনার অবতারণা। 'চারুলতা'-য় যেমন দু'টি প্রসারিত হাত মিলনের মুহূর্তে এসে শিলীভূত হয়ে যায় বিরাট ব্যঞ্জনার আভাস দিয়ে, মাল্যবানের প্রশান্তি তেমনি স্বপ্নের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে চূর্ণ হয় ঘুম ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে, অথচ 'চারুলতা' বা 'মাল্যবান' উভয় রচনাই অশান্তি পেরিয়ে প্রশান্তির জন্যই ব্যাকুল। যদি এই দুটি সৃষ্টি প্রশান্তির দরজায় করাঘাত করেও ফিরে এসে থাকে, তবু টিকে থাকার পথে কোনো বাধা আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

'বীঠোফেনের কোনো কোনো Symphony বা Sonata-র ভেতর অশান্তি রয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—কিন্তু আজো তো টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।' (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দ-র চিঠির অংশবিশেষ)

বাতিঘর

কৃষ্ণ ধর

[সামনে অবারিত সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে বালুবেলায়। দিগন্ত ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে জাহাজ। সমুদ্রসৈকতে মুখ-উপুড় করেকটা জেলে-নৌকো। পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। সমুদ্রের ধারে বাতিঘরের কাছে একটা ছোট্ট বাড়ির বারান্দায় বসে আছে নীলাদ্রি। তার সামনে বালির পাহাড় তৈরি করে খেলা করছে দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে শান্তা]

শান্তা। (পাহাড় সাজাতে সাজাতে)। এটা আমার পাহাড়।
নীলাদ্রি। এটা পাহাড়, না ইগলু?
শান্তা। ইগলু আবার কী?
নীলাদ্রি। ইগলু হল এস্কিমোদের বাড়ি
বরফের বাড়ি।
শান্তা। না এটা পাহাড়, আমার পাহাড়
সমুদ্র ওকে ছুঁতে পারবে না।
নীলাদ্রি। সমুদ্রের বুকে কত পাহাড় ঘুমিয়ে আছে
তার জলের অতলে।
শান্তা। (আরও বালি চাপিয়ে) আমি আরও উঁচু করে দেব
পাহাড়কে সমুদ্রের নাগালের বাইরে।
এই দ্যাখো কাঁকড়া।
নীলাদ্রি। ওরা লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসে
বালিতে লুকোয় ওরা আপন খুশিতে।
শান্তা। একটা...দুটো...তিনটে কাঁকড়া
এগুলো খুব ভালো, আমার পোষা।
নীলাদ্রি। কী করে চিনবে তাদের?
সব কাঁকড়াই তো দেখতে অবিকল এক
একই রকম তাদের ঘোরাফেরা, ব্যবহার।
শান্তা। মোটেই না, এদের সব্বাইকে চিনি আমি
চিনি আমি আলাদা করে
এগুলো আমার পোষা।
নীলাদ্রি। জান তো উঁচু থেকে, দূর থেকে
মানুষকেও অবিকল এক মনে হয়
যদি চড় বাতিঘরে, দেখবে নিচের দৃশ্য
মানুষের চলাফেরা, সবই ভারি মজাদার ছবি।
শান্তা। (বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে) আকাশের সমান উঁচু?
নীলাদ্রি। ওখান থেকে নিচের দিকে তাকালে

দেখা যায় লাল নীল হলদে বেগনি,
পোশাকের মুখোশ পরা যেন সব কাঁকড়ারই দল
ঘুরছে, ফিরছে, কেউ বা শুয়ে আছে সমুদ্রের তটে।
শান্তা। সমুদ্রের সঙ্গে কি ডাঙার
চিরকালের আড়ি?
নীলাদ্রি। আড়ি নয়, খুব তাদের ভাব।
শান্তা। তাহলে সমুদ্র কেন তার ঢেউয়ের আঘাতে
আমার বালির পাহাড় নেবে ভাসিয়ে?
কেন সে পর পর ছুঁতে আসে তাকে?
নীলাদ্রি। খুব বেশি ভাব বলে
বালিকে না ছুঁয়ে সে থাকতেই পারে না।
শান্তা। সমুদ্রের শেষ কোথায়?
নীলাদ্রি। তার শেষ নেই।
শান্তা। (অবাক হয়ে) যত দূর যাই শেষ নেই তার?
নীলাদ্রি। তার শুরু নেই শেষও নেই
মানুষের মনের মতো, আদি অন্ত নেই
সে শুধু পৃথিবীকে আদরে জড়িয়ে রাখে
মায়ের মতো
তার প্রাণকে, তার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।
শান্তা। কী করে জানলে তুমি?
নীলাদ্রি। কী করে জানলুম? আমি যে জাহাজে
চড়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি
দেশ থেকে দেশান্তরে, বন্দরে শহরে
নতুন মানুষজন, ঘরবাড়ি, সভ্যতা সমাজ
কত কিছু দেখেছি যে আমি!
শান্তা। এই বাতিঘর?
নীলাদ্রি। এ হল নাবিকের আকাশপ্রদীপ।
সমুদ্রের বুকে যারা ভাসে
তাদের পথ দেখায় সারারাত জেগে
পথহারাদের পথের নিশানা।
শান্তা। (হাততালি দিয়ে) এই দ্যাখো আমার কাঁকড়াগুলো
কী হুটোপাটি লাগিয়েছে
একটা...দুটো...তিনটে...চারটে
কাঁকড়াদের সভা বসে গেছে।
নীলাদ্রি। ঠিক মানুষেরই মতো
যদি চড় বাতিঘরে দেখবে নিচের দৃশ্য
মানুষের ঘরবাড়ি দেখতে যেন পুতুলের ঘর
সব যেন তোমার ওই কাঁকড়াদের বালির পাহাড়।

শান্তা। বাতিঘর কখন ঘুমোয়?
নীলাদ্রি। সূর্য জাগলে তার ছুটি।
বাতিঘর তো সমুদ্রের রাত্রির পাহারা
সমুদ্র ঘুমোয় না, বাতিঘরও না
সারারাত সে জেগে থাকে একা একা।
শান্তা। কার সঙ্গে সে কথা বলে?
নীলাদ্রি। যারা সমুদ্রে পথ খোঁজে
যারা শুধু নক্ষত্রের ভাষা বুঝে চলে
বাতিঘর তাদের সঙ্গেই আলোর সংকেতে
কথা বলে।
শান্তা। যখন ঝড় ওঠে?
নীলাদ্রি। ঝড়ের ডানা চেপে ধরি আমরা
নিকষ কালো মেঘের বুক চিরে
পৌঁছে দিই আলোর ঠিকানা।
শান্তা। (বালির পাহাড়ে হাত দিয়ে) ওই দ্যাখো আবার পালাল
একটা...দুটো...তিনটে...চারটে
আয়রে আয় আমার কাঁকড়াসোনা আয়
[হাততালি দিয়ে হাসে]
নীলাদ্রি। (শান্তার সুরে সুর মিলিয়ে) আয়রে আয়
শান্তার কাঁকড়াসোনা আয়।
শান্তা। (হঠাৎ খেলা ফেলে) মা...আমার মা কখন আসবে?
নীলাদ্রি। (ঘড়ি দেখে) এই সময় হল।
শান্তা। (সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো
কত বড় ঢেউ।
[ছুটে যায়]
নীলাদ্রি। বেশি দূরে যেও না শান্তা।
শান্তা। আমি ঢেউয়ের সঙ্গে ছুটব।
[বলতে বলতে সে ছুটে চলে যায়। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ। শোনা যায় ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে আসা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। সন্ধ্যে হয়ে আসে। জ্বলে ওঠে বাতিঘরের আলো। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল শবরী—শান্তার মা।]
শবরী। খেলাঘর বানাচ্ছ নীলাদ্রি?
নীলাদ্রি। আমি নয় শবরী, তোমার মেয়ে শান্তার
হাতে গড়া কাঁকড়াদের বাড়ি।
শবরী। শান্তা, শান্তা কোথায়?
নীলাদ্রি। শান্তা দৌড়ুচ্ছে ঢেউয়ের সঙ্গে।
শবরী। এককালে আমি দৌড়ে ফার্স্ট হতুম
তুমি ভাবতে পার?
নীলাদ্রি। সবই ভাবতে পারি শবরী

থামা মানেই পিছিয়ে পড়া।
তাই শুধু চলো, এগিয়ে চলো
পিছনে তাকাবার দরকার কী?
শবরী। কথায় বলে দৌড়ুতে পারলে দাঁড়াবে না।
নীলাদ্রি। (হাত ধরে টেনে) আর দাঁড়াতে পারলে বসবে না
এখন তো বসো।
শবরী। (হেসে) তোমার বাতিঘর সাক্ষী।
নীলাদ্রি। কীসের?
শবরী। তুমি আমায় হাত ধরে বসালে।
নীলাদ্রি। সে সবই দেখে কিন্তু বলে না কিছুই।
শবরী। (আরও ঘন হয়ে) আমার রক্তাক্ত হৃদয়।
নীলাদ্রি। (আদর করে) সমুদ্র সব শান্ত করে দেবে
সে তার নীল জলে ধুয়ে মুছে দেবে সব।
শবরী। আমার হৃদয় পর্যন্ত সে পৌঁছুতে
পারবে কি নীলাদ্রি?
সে তো ছুঁতে না ছুঁতেই ফিরে যায়
নিজেরই গভীরে।
নীলাদ্রি। ওটা তার ভারসাম্য
নইলে যে সব অতলে হারিয়ে যেত।
শবরী। আমিও ব্যালান্স রেসে প্রাইজ পেতুম
কিন্তু কী হল?
নীলাদ্রি। কে উত্তর দেবে শবরী?
সমুদ্র তো একা-একাই কথা বলে।
শবরী। উত্তর না পেলে আমি বাঁচব না
জীবনের জটিলতার পাকে বন্দী হয়ে
বিবর্ণ হয়ে গেছে সব।
নীলাদ্রি। সুন্দরের মৃত্যু নেই
নিজেরই ভস্ম থেকে সে আবার বেঁচে ওঠে
তুমি নিরাশ হয়ো না
তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে
বাঁচাতে হবে জীবনের যা কিছু সুন্দর।
শবরী। চারদিকে কাঁটাবন
চলতে গেলেই পায়ে লাগে।
নীলাদ্রি। তাতেই তো বাঁচার আনন্দ।
লতার মতো বাঁচা নয়
পুষ্পিত তরুর মতো, সূর্যের মদের মতো
লাল রঙ রোজ পান করে।
শবরী। জীবন কবিতার উপমা নয়।

নীলাদ্রি। কবিতাই জীবনের উপমার ঋণে
নিজেকে নির্মাণ করে।
শবরী। আমাদের বিবর্ণ জীবনে
কবিতা কোথায়?
সে তো গদ্যময়, সংগীতবিহীন।
নীলাদ্রি। গদ্য কিন্তু হেলাফেলা নয়
কবিতারই উৎস থেকে গদ্যের নির্মিতি
সচল, সুন্দর।
সমুদ্রের ঢেউ যদি কবিতার লাবণ্যে চঞ্চল
বালিভরা শক্ত তট গদ্যের বসতি।
শবরী। সমুদ্র কি আমার সব সন্তাপ
জুড়োতে পারে?
নীলাদ্রি। সমুদ্রের রহস্য জানে ওই নীল আকাশ,
তেজস্বী দুরন্ত সূর্য আর সিক্ত, তপ্ত বালুবেলা।
শবরী। শান্তাকে নিয়েই যত ভাবনা আমার।
নীলাদ্রি। (দূরে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো হরিণশিশুর মতো
শান্তা দৌড়ুচ্ছে খেলাচ্ছলে।
শবরী। শান্তা এক অদ্ভুত মেয়ে
এমনিতে মা মা করবে সারাক্ষণ
কিন্তু বাবা-অন্ত প্রাণ
যাকে আমি ছেড়ে এসেছি তার জন্য
তার আকুলতা।
নীলাদ্রি। আমরা ওকে ভুলিয়ে রাখব শবরী
ওকে ভরিয়ে রাখব ভালোবাসায়।
শবরী। এত বড় দাবি, আমাদের দুজনের দাবি
তুমি পারবে পূরণ করতে?
নীলাদ্রি। এখন নয়, সময় এলে প্রমাণ দেব।
আমি ছিলুম ঘর-পালানো, বাপে-তাড়ানো
মা-মরা দস্যি ছেলে
সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছি একটু মমতা,
একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্রয়ের আকুলতায়।
শান্তার মনটা আমি বুঝি।
শবরী। জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না
একবার আগুনে হাত পুড়িয়েছি আমি।
নীলাদ্রি। আমি তাতে প্রলেপ দিতে চাই
তুমি বিশ্বাস করো।
শবরী। আমার সব ইতিহাস জেনেও?
নীলাদ্রি। তোমার জন্মের জন্য তুমি দায়ী নও।

তোমার মায়ের ভুল কেন সারা জীবন
বইতে হবে তোমাকে?
কী তোমার দোষ?
[নীরবতা]
শবরী। বিশ্বাস করো নীলাদ্রি, আমি কিছু জানতুম না
মা আমাকে চিরকাল রেখেছেন দূরে দূরে
হস্টেলে, কনভেন্টে।
বাবাকে কোনোদিন দেখিনি,
শুনতুম তিনি বহুদিন নিরুদ্দেশ।
সবারই বাবা আসত হস্টেলে দেখা করতে
আমার কোনো ভিজিটর ছিল না।
কার্সিয়ঙে সেই ক'টা বছর কী ভীষণ নিরুত্তাপ,
নির্জন বিষাদ!
কী ভীষণ নিঃসঙ্গ করুণ!
আমি আর সেরকম জীবন চাই না শান্তার।
নীলাদ্রি। মানুষে মানুষকে দুঃখ দিয়েই বুঝি সুখ পায়,
তার কোনো পাপবোধ নেই।
শবরী। আমার মেয়ে?
তুমি তাকে সইতে পারবে?
যদি তোমার আমার মাঝখানে তার ছায়া পড়ে?
নীলাদ্রি। আমারও অতীত আছে তা তো জান
স্বাতী আমাকে ছলনা করেছিল।
শবরী। আমার বয়স!
[খানিকক্ষণ নীরবতা]
আমার বয়স? তুমি আমার শরীরটা
ভালো করে দ্যাখো নীলাদ্রি,
তুমি স্বপ্নের চোখে তাকিও না।
আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না,
যাকে সব উজাড় করে দিয়েছিলুম
সে হেলাফেলায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল
এখন আমার আর কী আছে দেবার?
কী আছে?
নীলাদ্রি। দোহাই তোমার, ও কথা বোলো না
আমাকে ভালোবাসতে দাও।
শবরী। (অন্য মনে) ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে
[নীরবতা]
এরকম সুজয়ও বলত,
দিনরাত কানের কাছে মৌমাছির মতো

সেই অলৌকিক গুঞ্জরন :
আমাকে ভালোবাসতে দাও...ভালোবাসা শর্তহীন
সে সব-কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে।
আহ্, সেই অসামান্য দিনগুলি থেকে খসে-পড়া
স্বপ্নের পালক পড়ে আছে পাহাড়ী ঝরনার পাশে
পড়ে আছে ডানাভাঙা পাখি।
পাহাড়ের রূপোলী নৈঃশব্দ্য জানে,
জানে তিস্তার দুরন্ত জল
সেই সব স্মৃতি আমি দুহাতে ঝেড়ে ফেলে এসেছি।
নীলাদ্রি। তাই এসো নতুন স্বপ্নের নীড়ে।
শবরী। আমার ভয় করছে,
আমি নতুন করে কিছুই ভাবতে পারছি না।
নীলাদ্রি। আমার তাড়া নেই শবরী,
তোমার যখন সময় হবে তখনি
আমারও সময়।
শবরী। জন্মাবধি মুখোশ-পরা ভয়
আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
যতবার তার কাছ থেকে পালাতে চাই
সে হিংস্র ছায়ার মতো আমাকে তাড়া করে।
নীলাদ্রি। তুমি অধীর হোয়ো না।
শবরী। আমি যতবার দূরে চলে আসি
ততবার সেই স্মৃতি হানা দেয়
আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়ে যায়।
কেন স্মৃতি? কেন দুঃখ? কেন এই নির্লিপ্ত বিষাদ?
কেন? কেন? কেন?
[হাত দিয়ে মুখ ঢাকে]
নীলাদ্রি। তুমি নিজেকে বুঝতে শেখো।
শবরী। কী বুঝব? কেমন করে বুঝব?
নীলাদ্রি। সমুদ্র যেমন বুঝতে পারে তার গভীরকে
আকাশ যেমন জানে তার অসীম অনন্তকে।
শবরী। সে কি বোঝা? না বোঝার রূপক?
[নীরবতা]
আমি জানিনে, কিচ্ছু জানিনে।
তুমি ঠিক জান? ভুল করে ভুল পথে
পা দাওনি তো?
নীলাদ্রি। কীসের ভুল?
শবরী। এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা?
ঘর সে তো মরীচিকা...তৃষ্ণার্তকে নিয়ে যায়

লোভ দেখিয়ে
তারপর শূন্যে মিলিয়ে যায়।
পড়ে থাকে তপ্ত মরু, নির্মম সূর্যের তাপ
আর তৃষ্ণাতুর দিগন্ত জুড়ে
মৃত্যুর হাতছানি।
নীলাদ্রি। আজ এ কথা কেন?
শবরী। শান্তা, কী ভাববে শান্তা?
নীলাদ্রি। ও হবে আমাদের দুজনের মাঝখানে
স্বপ্নের সেতু।
শবরী। যে মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে
তারই রক্ত ওর গায়ে।
নীলাদ্রি। তুমি ওকে বুঝতে দাও
ভালোবাসাহীন জীবন কী করুণ অভিশাপ!
তুমি ওকে সে কথা বোঝাও।
শবরী। সে কি অতশত বুঝতে পারে?
নীলাদ্রি। সে তো জানে তুমি সব ছেড়ে
চলে এসেছ।
সে তো জানে তুমি নিঃসঙ্গ একাকী।
সে তো জানে কীভাবে বঞ্চিত তুমি!
শবরী। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না
জীবনের স্বপ্ন দেখা যাকে দিয়ে শুরু
সে দস্যুর মতো আমার স্বর্ণচাঁপা দিনগুলো
লুঠ করে নিয়ে গেছে।
এখন সে কেড়ে নিতে চায় আমার শেষ সম্বল
আমার শান্তাকে
নিষ্ঠুর, নির্মম।
নীলাদ্রি। এখনও তারই ছায়া।
শবরী। দুঃস্বপ্নের ছায়া
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি
কে যেন শান্তাকে চুরি করে নিয়ে যায়
পাহাড়ের বাঁকে পথ হারিয়ে আমি ডাকি,
শান্তা, শান্তা...কোথায় আমার শান্তা?
আমি ছুটে যাই তাকে খুঁজতে।
প্রতিধ্বনি ফেটে পড়ে অট্টহাসিতে
সে হাসি আমার চেনা...অবিকল সুজয়ের কণ্ঠস্বর।
নীলাদ্রি। তার মুখ?
শবরী। মুখটাই তার মুখোশ
আমিই শুধু চিনতে ভুল করেছিলুম।

[নীলাদ্রি উঠে পায়চারি করে। সমুদ্রের দিকে তাকায়। দূরে বাতিঘরের ঘূর্ণায়মাণ আলো দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। শান্তা ছুটতে ছুটতে ঢোকে]

শান্তা। (মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে) মা দ্যাখো,
কত কিনুকে কুড়িয়েছি।
[বালির পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে]
ওমা, আমার কাঁকড়াসোনা কোথায়?
এই যে, একটা...দুটো...তিনটে...চারটে
আয় এদিকে আয় বলছি।

নীলাদ্রি। (শবরীকে) তোমার রোহিণী আছে তো?
একটু তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করতে বলি।
[ভিতরে চলে যায়]

শান্তা। মা, তুমি অমন করে বসে আছ কেন?

শবরী। একটু গল্প করছিলুম।

শান্তা। কী গল্প?

শবরী। এক রাজকন্যার, যার ভারি দুঃখ।

শান্তা। ও গল্প আমি শুনব না।
আজ কি বাবা আসবে?

শবরী। তোমার বাবা তো আমার কাছে
আসবে না।

শান্তা। আমি বাবার কাছে যাব।

শবরী। আমাকে ছেড়ে যাবি তুই?

শান্তা। তুমি বাবাকে ভালোবাসো না?

শবরী। শান্তা!

শান্তা। আমি জানি, আমি জানি মা
তোমরা কেউ কাউকে ভালোবাসো না।

শবরী। ও কথা বলছিস কেন?
আমি তো তোকে ভালোবাসি,
তুই তো আমাকে ভালোবাসিস।

শান্তা। আমি সব্বাইকে ভালোবাসি
তুমি আমার মা...আমার সোনা মা।
[মাকে আদর করে]

শবরী। রোহিণী, রোহিণী

[পরিচারিকা রোহিণী চায়ের ট্রে নিয়ে ঢোকে। সঙ্গে নীলাদ্রি।]

শান্তা, তুমি এখন রোহিণীর সঙ্গে যাও

রোহিণী। এসো দিদিমণি, আমরা যাই
দুজনে খেলা করিগে।

[শান্তাকে নিয়ে রোহিণী চলে যায়। নীলাদ্রি চা খেতে খেতে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে শিরোনাম-গুলো জোরে জোরে পড়তে থাকে।]

নীলাদ্রি। যা করেছি তার জন্য অনুতপ্ত নই :
বন্দীরা মৃত্যুর সময়েও তৃষ্ণার জল পায়নি;
ময়দানের একশো গাছ বিদায় নিতে চলেছে;
পাখিরা আসছে চিড়িয়াখানার লেকে।

শবরী। কোথাকার পাখি?

নীলাদ্রি। সুদূর সাইবেরিয়ার।

শবরী। কী করে ওরা পথ খুঁজে পায়?
কে ওদের নিশানা বলে দেয়?

নীলাদ্রি। ঝরনা যেমন জানে তার নদীকে
ভ্রমর যেমন জানে ফুটন্ত পদ্মদল
এইসব পাখিরাও আকাশের গন্ধ চিনে চিনে
দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেয় নির্ভুল ডানায়।

শবরী। শীতের অতিথি ওরা ফিরে যায়
একই পথে?

নীলাদ্রি। আকাশের উষ্ণতা ওদের ডেকে নিয়ে আসে
ওদের আছে ডানা, আছে মাটির আকর্ষণ
ওরা রৌদ্রের করতলে ছায়া ফেলে মুখে।

শবরী। শুধু আমরাই পথ ভুল করি।

নীলাদ্রি। সে ভুল তো তোমার নয় শবরী,
তুমি পিছনের দিকে তাকিও না।
অফুরন্ত রোদের ভিতর তুমি দ্যাখোনি
পাখিরা যেমন সহজেই ডানা মেলে ওড়ে।

শবরী। শান্তা আমাকে ভুল বুঝবে
এ আমি সইতে পারব না।
আমারই রক্ত দিয়ে গড়া যার অস্তিত্ব
তার ভুল বোঝা নির্মম অভিশাপ।
[রোহিণীর প্রবেশ]
বাতিঘর থেকে লোক ডাকছে বাবুকে।

নীলাদ্রি। আমি আসছি শবরী,
এসে আমরা বেড়াতে যাব।
[নীলাদ্রি চলে যায়। প্রকাণ্ড বেলুন হাতে নিয়ে শান্তা ঢোকে। রোহিণী বেরিয়ে যায়।]

শান্তা। মা

শবরী। (হঠাৎ চমক ভেঙে) বেলা হয়ে গেল?

শান্তা। আমি এখন তোমার কাছে থাকব।

শবরী। আমি একটু বেরব নীলাদ্রির সঙ্গে।

শান্তা। আমিও যাব।

শবরী। এখন তুমি যাবে না,
আমরা এক্ষুনি আসব।

শান্তা। না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[মায়ের আঁচল ধরে মাথা নিচু করে থাকে। তারপর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।]

শবরী। (আদর করে) বুড়ো মেয়ে আবার কাঁদে।

শান্তা। না, তুমি যাবে না,
আমি তোমার কাছে থাকব।

শবরী। রোহিণী, রোহিণী!

শান্তা। না না আমি রোহিণীর কাছে থাকব না
তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো
আমি এখানে থাকব না
আমি এখানে কাউকে ভালোবাসি না।

শবরী। শান্তা, অমন অবুঝ হোসনে শান্তা।

শান্তা। তুমি যাবে না, যাবে না, কোথাও যাবে না
তুমি ওই বাতিঘরের দিকে আর যাবে না।
তুমি গেলে আমি ও-সমুদ্রে হারিয়ে যাব
ঠিক দেখো।

শবরী। (আর্তকণ্ঠে) শান্তা, তুই চুপ কর শান্তা,
চুপ কর।

[শান্তাকে জড়িয়ে ধরে শবরী কাঁদতে থাকে। বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান আলোর রেখা অন্ধকার আকাশের বুকে পথের নিশানা দেখায়। রাত্রির বুকে শোনা যায় তটভাঙা ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন ছলাৎছল শব্দ। সেও ওদের দুজনের কান্নারই মতো।]

সুরসাধক ভীষ্মদেব

নারায়ণ চৌধুরী

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি লোকান্তরিত হলে প্রচলিত বিয়োগাত্মক ভাষা একটা অভ্যাসমসৃণ বুলির মতো অনুসরণ করে বলা হয় যে, যিনি চলে গেলেন তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সুরকার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও একথা বলা হয়েছে এবং বলা হতে থাকবে। কিন্তু তাঁর শূন্যস্থান পূরণ না হওয়ার কথাটা নিছকই একটি শূন্যগর্ভ বাচ্যালঙ্কার নয়; তা যথার্থই একটি অর্থবোধক আন্তরিক উক্তি। সত্যই ভীষ্মদেবের শূন্যস্থান সহসা কিংবা সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি যে-শূন্যতার সৃষ্টি করে গেলেন তার একটা আলাদা মাত্রা বা আয়তন আছে, আর যেহেতু তার একটা আলাদা মাত্রা বা আয়তন আছে সেই কারণে তার একটা আলাদা তাৎপর্যও আছে। সেই আলাদা তাৎপর্য কী, বর্তমান প্রবন্ধে সেইটাই পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য খানিকটা চিন্তা-চর্চা করা যেতে পারে।

ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রথম বয়সে নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, পরে তিনি দীর্ঘকাল ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের কাছে একনিবিষ্ট তালিম নিয়েছিলেন, কিংবা জীবনের একটা পর্বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকেও তাঁর কিছু কিছু গান বা সংগীতাংশ আহরণ করবার সুযোগ হয়েছিল—এসব তথ্য ভীষ্মদেবের মরণোত্তর স্মরণ-লিপিগুলিতে কম-বেশি বিশদভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর সেগুলির পুনরাবৃত্তির সার্থকতা দেখি না। সুবিদিত তথ্যগুলির উপর নতুন করে আর একপ্রস্থ দাগা বুলিয়ে লোকান্তরিত শিল্পীর জীবনের একটা পূর্ণাবয়ব ছক হয়তো তুলে ধরা যায়, কিন্তু জীবনপঞ্জী রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়নি। পরন্তু, ভীষ্মদেবের সংগীতের বৈশিষ্ট্যবিচারই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। ভীষ্মদেব কেন ভীষ্মদেব হয়েছিলেন, কেন আর কারোর দ্বারা তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়, কোথায় অন্যান্য কৃতী বঙ্গীয় সংগীতসাধকদের সঙ্গে তাঁর সুরসাধনার পার্থক্য আর প্রস্থান-রেখা, তার নিরূপণই এই প্রবন্ধের মূল অন্বিষ্ট।

ভীষ্মদেবের সংগীতজীবনকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯২২ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো কি চোদ্দ, তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েসে নিধুবাবুর দুটি টপ্পা ('এত কি চাতুরী সহে প্রাণ' ও 'সখী কি করে লোকেরই কথায়') রেকর্ড করেছিলেন। সেই কাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক ১৮ বৎসর কাল তাঁর সংগীতজীবনের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নিষ্ক্রমণ এবং অবস্থিতি। এবং তৃতীয় কিংবা সর্বশেষ অধ্যায় অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় (১৯৪৮) থেকে শুরু করে ১৯৭৭-এ মৃত্যু পর্যন্ত কমবেশি ২৯ বছর কালের বিস্তৃত পর্ব। এই তিন অধ্যায়ের মধ্যে প্রাথমিক পর্বটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে গৌরবজনক। কেননা এই পর্বে ভীষ্মদেবের প্রতিভা ব্যাপ্তিতে আর গভীরতায় তার তুঙ্গসীমা স্পর্শ করেছিল। তারও মধ্যে আবার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০—এই এক দশক সময়কে সর্বোত্তম কাল বলা যায়। ভীষ্মদেবের সৃষ্টিশীলতা আর জন-প্রিয়তা যেন এই কালে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছিল এবং যত তাঁর ব্যক্তিত্বমধ্যে সৃষ্টিশীলতার বিচ্ছুরণ হয়েছে ততই যেন তাঁর জনপ্রিয়তাও একটির পর একটি পাপড়ি উন্মোচন করে তার পূর্ণ-প্রস্ফুটিত রূপে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মদেবের জনপ্রিয়তা লোকপ্রচলিত সস্তা জনপ্রিয়তা ছিল না। তা ছিল তাঁর স্বীকৃত সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সহিত সংগতিপূর্ণ, সমানুপাতিক, এবং তা থেকে প্রসূত। জনপ্রিয়তাকে হালকা লোকরঞ্জন-ক্ষমতার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখা সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত সব সময় গ্রাহ্য নয়। তার কারণ, সংগীতের সর্বজনীন আবেদনের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা মানুষের গভীরতম সত্তাকে পর্যন্ত আলোড়িত করতে পারে, করেও থাকে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরোৎকর্ষের মধ্যে বিদ্যমান কিছু কিছু উপকরণ আপামর জনসাধারণকে বিমোহিত করবার ক্ষমতা রাখে। কাজেই তিনি জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন, অতএব তাঁর সৃরসৃষ্টি কিঞ্চিৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত, এ-জাতীয় মনোভাব এক্ষেত্রে মান্যতা না পাওয়াই ভাল। তিনি লোকপ্রিয় গায়ক ছিলেন, সুতরাং তাঁকে সর্বভারতীয় স্তরের ওস্তাদ বলা যায় না—এরকম ইঙ্গিত দু-একটি পত্র-পত্রিকার বিয়োগ-পঞ্জীতে আভাসিত হতে দেখেছি। বলা বাহুল্য যে, এই ইঙ্গিত ভীষ্মদেবের সর্বজনস্বীকৃত প্রতিভার অবমাননার সমতুল্য। জনপ্রিয়তা ভীষ্মদেবের প্রতিষ্ঠার অন্যতর আয়তন মাত্র, সেইটাই সব নয়।

ভীষ্মদেবের পণ্ডিচেরী অবস্থিতির কাল সংগীতসৃষ্টির দিক থেকে কমবেশি বন্ধ্যা বলা যায়। এ পর্বে তিনি সংগীতচর্চা মূলতুবি রেখে অধ্যাত্মসাধনার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের কমবেশি দীপ্তিহীন বিষয় অবস্থানের আলোকে এই পশ্চাদ্ধাবনকে আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভীষ্মদেব চিরকালই একটু ধর্মপ্রবণ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং ধর্মের গূঢ় রহস্য জানবার জন্য অস্থিরচিত্ত। বাল্য আর কৈশোরের বেশ কিছুকাল তিনি ধর্মাচরণের বহিরঙ্গাবেশে গেরুয়া নিজ অঙ্গে ধারণ করে-ছিলেন এবং ব্রহ্মচারীর মতো থাকতেন। তাই বলে খ্যাতির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করবার পর হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, পরিবার-পরিজনের মায়া ত্যাগ করে, সংসারধর্ম পিছনে ফেলে, পণ্ডিচেরী আশ্রমে প্রস্থিত হবার মতো কী ঘটেছিল আজও আমরা তার সঠিক হদিশ খুঁজে পাইনি। হতে পারে, সংসারের মায়া তাঁর ধর্মসাধনার প্রতিবন্ধকতা করছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধর্মসাধনার উপায় ও উপকরণ কি সেই অবস্থাতেই তাঁর করায়ত্ত ছিল না? আমরা তাঁর সংগীতচর্চার কথা বলছি। তবে কেন তিনি সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরী যাওয়ার আকুলতা বোধ করলেন? সংগীত যাঁর হস্তা-মলকবৎ এক সহজায়ত্ত শিল্প, তাঁর কি আর অন্য ধর্মসাধনার প্রয়োজন আছে? আর কেনই বা এই প্রয়োজন? সংগীত নিজেই তো শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনার এক অঙ্গ, অথবা সেইটেই ধর্মসাধনা।

সংগীতবিদ্যা নাদবিদ্যা। তার অর্থ, বিশ্বজগৎ-চরাচরে যে-অনাহত নাদ জ্যোতিস্তরঙ্গের আকারে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাকে স্বরের মাধ্যমে আন্দোলিত করে তোলার শিল্পের অপর নামই সংগীত। অনাহত নাদের আহত রূপকেই বলা হয় সংগীত। এই অনাহত-নাদ আর কিছু নয়, বিশ্বচরাচরপরিব্যাপ্ত সর্বত্রবিদ্যমান পরম চৈতন্যের প্রতীক। তাই যদি হয়, তাহলে ভীষ্মদেব কোন্ চতুর্বর্গ ফললাভের আশায় সংগীতসাধনা ছেড়ে অন্য সাধনায় মনপ্রাণ ঢেলে দেবার জন্য যোগাশ্রমে ধাওয়া করেছিলেন? এ কি ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের নিষেধন নয়? হাতের একটি পাখিকে ছেড়ে বনের দুটি পাখির জন্য এই আকুলিবিকুলি কি স্বীয় স্বভাবকে খণ্ডন করারই নামান্তর বোঝায় না?

আমি আজও ভেবে পাইনে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য কারণে ভীষ্মদেব তাঁর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে স্বেচ্ছানির্বাসনে নিজেকে পাঠিয়েছিলেন? এরকম ভুল যে তাঁর কেন হল, কে বলতে পারে তার ভিতরের রহস্যের কথা? সংগীত যাঁকে মুক্তি দিতে পারত, তিনি গেলেন কিনা অন্যপ্রকার মুক্তির সন্ধানে ভিন্নতর সিদ্ধির হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে বিপথের অভিমুখে! আমার মনে হয়, ভীষ্মদেবের এই স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মগ্রহণের পেছনে তাঁর মস্ত বড় বিচারভ্রান্তি হয়েছিল। একজন

অপরিসীম প্রতিভাধর সংগীতসাধকের সমস্ত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁকে তাঁর পূর্বতন অস্তিত্বের ছায়ামাত্রে পর্যবসিত করাটা যে কত বড় ভুল হয়েছে তার বুঝি পরিমাপ হয় না।

পণ্ডিচেরী গিয়ে তিনি সংগীতসাধনায় নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্য কোন্ সাধনার নিষ্ঠায় তিনি অতন্দ্র হয়েছিলেন তার খবর জানা যায় না। নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তাঁর একূল-ওকূল দুকূলই খোয়া গিয়েছিল। তিনি 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে উঠে-ছিলেন। আট বৎসর আশ্রমবাসের ফলে তাঁর ধর্মসাধনার পথ কতকটা প্রশস্ত হয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু যেটা সকলে চোখের উপর দেখতে পেল, সুস্পষ্ট অনুভব করল, তা হল সংগীতসাধনার ক্ষুরধার পথ থেকে তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য বিচ্যুতি আর স্খলন। তাঁর সেই আগের দিনগুলির কণ্ঠের ঔজ্জ্বল্য, ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, প্রাণশক্তি আর আনন্দের কলহাস্যমুখরতা—কিছুরই আর কণামাত্র অবশিষ্ট ছিল না যখন ১৯৪৮ সালের মাথায় মোহভঙ্গ হয়ে আশ্রম থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। এবারে আমরা কলকাতার জীবনে যে ভীষ্মদেবকে পেলাম তা আমাদের আগেকার দেখা আর চেনা ভীষ্মদেবের কঙ্কাল বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এ নূতন ভীষ্মদেব পুরাতন ভীষ্মদেবের স্মৃতি-মাত্রবহনকারী এক বিষণ্ণ সত্তা—তাতে প্রাণ আছে কি নেই ঠিক ঠাহর হয় না। একটা জীবন্ত, অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ, সৃষ্টির আবেগে ভরপুর, স্ফূর্তিমন্ত মানুষ নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডবৎ হয়ে ওঠাটা যে কত বড় শোকাবহ ঘটনা তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব।

পণ্ডিচেরী অবস্থানকালে ভীষ্মদেবের অন্তর্জীবনের কি কোনোরূপ উন্নতি হয়েছিল? আমরা ঠিক বলতে পারব না। আমাদের বন্ধুবান্ধব-পরিচিত জনদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে অত্যুৎসাহী, ধর্মের প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই ভাবোন্মাদনায় যাঁদের চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম হয়, তাঁরা বলতে চান যে, ভীষ্মদেব আট বৎসর কালস্থায়ী পণ্ডিচেরী বাসের ফলে অধ্যাত্মমার্গের অনেক উচ্চস্তরে অধিরোহণ করেছিলেন, তাঁর সিদ্ধি বাইরে থেকে প্রত্যক্ষগোচর হওয়ার মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু নয়, তা ভিতরে ভিতরে অনুধাবন এবং অনুভব করবার জিনিস। কিন্তু এই অনুভব-গম্যতা বুঝি আমাদের আয়ত্তের বাইরেকার ব্যাপার। আমরা যাঁরা সাধারণ স্তরের মানুষ, চর্মচক্ষে যা দেখি তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাই না, তাদের চোখে ভীষ্মদেব একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিলেন। পণ্ডিচেরী থেকে ফিরে আসার পর কিঞ্চিন্যূন তিন দশক কাল কলকাতায় বাস করেছেন, কিন্তু সেই বাসকে প্রায় অজ্ঞাতবাসের কোঠায় ফেলা যায়। এই কি সেই ভীষ্মদেব, যাঁকে আমরা জানতুম চিনতুম ভালবাসতুম, যাঁর প্রতিটি সুরের লহরীলীলায় শ্রোতার শ্রুতির স্রোতে ভেসে উঠত আনন্দের অগণিত পাম্নাচুনীমোতি ও মরকত-খণ্ড, যাঁর সুরের সম্মোহনে চারিদিককার পরিমণ্ডল এক লহমায় সুরময় হয়ে উঠত এবং তার প্রভাবে তাবৎ সুর একটিমাত্র সুরে সংহত হয়ে আবহের ভিতর গম্‌গম্ করত? যে সুরকে প্রাচীন ঋষিরা 'ওঙ্কার' নামে অভিহিত করেছেন, যা সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বচরাচরময় যে ধ্বনিতরঙ্গের বিস্তৃতি, সেই মন্ত্র মানুষধ্বনিকে ভীষ্মদেব চকিতে আবাহন করতে পারতেন তাঁর সংগীতের জাদুতে। কী অসাধারণ প্রাণের দীপ্তি ছিল এই মানুষটির! যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলেন, চিত্তের স্ফূর্তিতে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন। কোথায় গেল সেই প্রাণের দীপ্তি, অন্তরের উল্লাস, কোথায় গেল নিত্য নবনব সুরসৃষ্টির দৈবী ক্ষমতা?

ভীষ্মদেব তো শুধুই গায়ক বা সুরকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুরদ্রষ্টা আর সুরসাধক। তাঁর সুরসাধনাই ছিল ধর্মসাধনা, এ ভিন্ন আর কোন ধর্মসাধনার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। সেই মানুষটি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে কীরকম বদলে এলেন সে তো আমরা চোখের উপর দেখতে পেলুম। এরপরেও যাঁরা বলেন ভীষ্মদেবের আশ্রমবাস তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সমৃদ্ধির কারক হয়েছিল তাঁরা

নিজেদের প্রবঞ্চনা করেন, অপরকেও প্রবঞ্চনা করেন। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি এই যে, পণ্ডিচেরী গমনের ফলে ভীষ্মদেবের এবং দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। এতদ্দ্বারা দেশ তার একজন শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাকে হারিয়েছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, যোগমার্গের শরণ নেওয়ার ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার উত্তরে বলব যে, ধর্মের ক্ষেত্রে এটা যদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় তাহলে সংগীতের ক্ষেত্রে এটা অবনতির প্রমাণ। ধর্মের পক্ষে যা লাভ, তা সংগীতের পক্ষে ক্ষতি। ভীষ্মদেব কলকাতায় ফিরে আসার পর পুরানো দিনের ভীষ্মদেবকে আর আমরা কখনো ফিরে পাইনি। এক নিষ্প্রভ, নিরুত্তাপ, নিরুজ্জ্বল গায়ক-সত্তা আমাদের মধ্যে বাস করে গেছেন গত তিরিশ বৎসর কাল, যাঁর ভৌতিক দেহ এই সেদিন ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমের মুখে পঞ্চভূতে অবসিত হয়ে গেল।

ভেবেছিলাম ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাটা উহ্য রাখব কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ভীষ্মদেবের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের জন্যেই ব্যক্তি-প্রসঙ্গের কিছু পরিমাণ অবতারণা করা দরকার, নয়তো তাঁর সাংগীতিক পরিচয়টাই কেবলমাত্র দেওয়া হবে। তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে আভাসিত হবে না লেখায়। অথচ মানুষটা ভীষ্মদেব কেমন ছিলেন সেটা জানতে চাওয়াও পাঠকের পক্ষে একান্তরূপে স্বাভাবিক।

বছর তিন-চার আমি ভীষ্মদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটা তাঁর পণ্ডিচেরী নিষ্ক্রমণের আগের অধ্যায়ের কথা। সেই সময়ে তিনি ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত সংগীতাভ্যাস করছেন এবং জেলিয়াটোলাস্থিত বলরাম দে স্ট্রীটের নিজগৃহে বহু-সংখ্যক শিষ্য-অনুশিষ্যকে গানের তালিম দিচ্ছেন। আমি সাধারণত সকালের দিকেই তাঁর বাড়ি যেতাম। প্রায় প্রত্যহ নটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সংগীতের চর্চা চলত, শিষ্যেরা গাইতেন, নিজেও প্রায়শ তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ যোগ করতেন। যেদিন গানের 'মেজাজ' আসত, সেদিন নিজেই অবিরলধারে গেয়ে যেতেন সুরাবিষ্ট এক সম্মোহিত জনের মতো। পড়ে থাকত তালিম, পড়ে থাকত আর সবকিছু। ওইসব প্রাতঃকালীন একান্ত আসরেই ভীষ্মদেবের সংগীত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি এত কাছে থেকে সন্দর্শন করার বিরল সুযোগ আমাদের জীবনে ঘটেছিল। ভীষ্মদেবের সেই তন্ময় সাধকের রূপ কখনও ভুলতে পারব না। এই হয়তো বন্ধু-সখা-শিষ্যপরিবৃত হয়ে হাস্যপরিহাস করছেন কি জাগতিক স্তরের কথাবার্তা বলছেন, কিন্তু কণ্ঠে সুরের ছোঁয়া লাগতেই একেবারে অন্য মানুষ। ধ্যানসমাহিত তাঁর সে রূপে একমাত্র আত্মস্থ যোগীর রূপের সঙ্গেই তুলনীয়। যেদিন বাদল খাঁ সাহেব আসতেন, সেদিন আসর এগোত না, শিক্ষার্থী-দের গান শেখার পালা চুকিয়ে ওস্তাদজীকে নিয়ে উপরের ঘরে চলে যেতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবীণ-নবীন খ্যাতমান-অখ্যাত—সব স্তরের মানুষই ছিলেন। শিষ্য বা সংগীত-কুতূহলী-রূপে যাঁদের ওই সময়ে ভীষ্মদেবের গৃহে প্রায় নিয়মিত আনাগোনা করতে দেখেছি তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি—শচীন দেববর্মণ, যূথিকা রায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, নরেন মুখোপাধ্যায়, জীবন উপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী (সংগীতশাস্ত্রী সুরেশ চক্রবর্তী নন, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি), ভোলা সেন, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দেখতাম ভীষ্মদেব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে জমাটভাবে আসর সরগরম করে রাখতে ভালবাসলেও অন্তরে কোথায় যেন তিনি একাচারী ছিলেন। এই মুহূর্তে হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণোচ্ছলভাবে গল্পগুজব করছেন, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরে তলিয়ে যেতেন। বেশ বুঝতে পারা যেত, বাইরের সামাজিক জীবনের সমান্তরালে তাঁর একটি নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন ছিল, যেখানে তিনি একক ও জিজ্ঞাসু। খুব সম্ভব এই একাকিত্ব ও জিজ্ঞাসাপ্রবণতার সূত্র ধরেই

পণ্ডিচেরীর আশ্রমিকরা তাঁর হৃদয়মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই পথে তাঁকে সংগীত-জগৎ তথা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

ভীষ্মদেবের সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক ছিল, আবার একপ্রকার সৌখ্যও ছিল। সৌখ্যের বশে—যখন ধারেকাছে অন্য কেউ ছিল না তখন তিনি একদিন আমাকে পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সাধ্যমত সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কারণ, পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু আমি কি তখন জানি যে দিলীপকুমারের উৎসাহে তিনি ভিতরে ভিতরে পণ্ডিচেরী যাওয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছেন? জানলে নিশ্চয়ই আমি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতাম এবং সর্বসাধ্য উপায়ে তাঁর যাওয়া আটকাতাম। এক ছুটিতে দেশের বাড়ি কুমিল্লায় যাই, সেখানে বসেই খবর পাই ভীষ্মদেব বাংলাদেশ ও কলকাতার মায়া কাটিয়ে, পরিবার-পরিজনদের মোহপাশ ছিন্ন করে, পণ্ডিচেরী প্রস্থান করেছেন। বাংলার সংগীতজগতের পক্ষে এ যে কত বড় বিপর্যয় তার ধারণা তখন মনে সমাকরূপে প্রতিভাত না হলেও পরবর্তী ঘটনার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমতেই তা উপলব্ধি হয়েছিল এক সময়ে। কিন্তু হায়, তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না।

ভীষ্মদেবের কয়েকটি চরিত্রবৈশিষ্ট্য কাছে থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্য কারও শক্তিমত্তাকে খাট করে দেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর মুখে অপরের নিন্দা-মন্দ কখনও শুনিনি। যেখানে প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পারতেন না, চুপ করে যেতেন। রবীন্দ্রসংগীতের তিনি অনুরাগী ছিলেন এমন বলা যায় না, (সত্যিকারের রাগশিল্পীর পক্ষে অনুরাগী হওয়া সম্ভবও নয়), কিন্তু চেষ্টা করেও তাঁকে রবীন্দ্র-সংগীতের সমালোচনায় আকর্ষণ করতে পারিনি। তিনি ওই প্রসঙ্গে নীরব থাকতেন। তিনি ভোজন-প্রিয় ছিলেন, মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু পেটুক তাঁকে কোনমতেই বলা যায় না। কারণ দিনের পর দিন স্রেফ তাঁর অতিপ্রিয় পানদোক্তা আর চা খেয়ে কাটিয়েছেন তার নজির আছে। ভোজন-রসিকতার অন্তরালে তাঁর অন্তরের এক নিবিড় বৈরাগ্য ছিল, যার সন্ধান শুধু তাঁর অতি নিকট জনেরাই রাখতেন ও পেতেন। ইংরিজি সিনেমা দেখার বেজায় শখ ছিল (চতুর্থ দশকের কথা বলছি), কিন্তু কী আশ্চর্য, দল বেঁধে দেখতেন না, একা-একা দেখতেন আর তাও নাইট-শোয়ে। আমার মনে হয়, বিদেশী ছবির মিউজিকের আকর্ষণে তাঁর ওই একক নৈশ অভিযান। বিলিতি বা হলিউডের ছবি যত রদ্দিই হোক, সেগুলির অধিকাংশেরই মিউজিক রীতিমত তারিফ করবার মতো। অন্তত আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে। ভীষ্মদেব একাধিক চলচ্চিত্রের সংগীত-পরিচালক ছিলেন। হয়তো বিদেশী ছবি থেকে সুরের 'ফ্রেজ' আহরণ করে দেশী ছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ করবার তাগিদে তাঁর এই নিশীথ সিনেমা পরিক্রমায় তিনি বের হতেন, ঠিক বলতে পারব না।

ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর যে খুব উচ্চাগ্রের ছিল তা বলা যায় না। এর চাইতে উৎকৃষ্টতর কণ্ঠ-স্বরের অধিকারী শিল্পী আমাদের জীবৎকালেই আমরা দেখেছি, যেমন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠ। আমি আপাতত বাংলার রাগ-সংগীত-গায়কদের কথাই বলছি, অন্যান্য রাজ্যের শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিতুলনার মধ্যে যাচ্ছি না। সাধারণত বেশ একটু চড়া সুরে তিনি গাইতেন। ঠুংরীর স্কেলের যেটা মড়্‌জ কিংবা ঋষভ সেটাই ছিল তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক 'সা' সুর। অর্থাৎ তিনি হারমোনিয়মের স্কেলের 'ঈ' কিংবা 'এফ শার্প'-এ সচরাচর সুর বেঁধে গান গাইতেন। যার ফলে মেয়েদের কণ্ঠস্বরের মতো প্রায়ই একটা ধাতব সুর ফুটে উঠত তাঁর গলায়। পুরুষের কণ্ঠে এই ধাতব ঝঙ্কারধ্বনি, বলাই বাহুল্য, খুব সুমধুর স্বরাভাস বয়ে আনত না, বরং

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই ধাতব ধ্বনির মধ্যে একটা কার্কশ্যের দ্যোতনা ছিল। কিন্তু এই সহজাত ত্রুটিপূর্ণ কণ্ঠস্বর নিয়ে তিনি কী অপূর্ব সুরসৃষ্টিই না করতে পারতেন। তাঁকে সুরের জাদুকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুর যেন তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে ফুলঝুরির মতো ঝরে ঝরে পড়ত। তাঁর রাগপ্রধান বাংলা গানগুলো যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার এ কথার সঙ্গে সায় দেবেন যে, তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষমতার কোন পারাপার ছিল না। কী কথার সুললিত উচ্চারণে, কী সুরবিস্তারের মাদকতায়, কী সরগম সংযোজনার লাবণ্যে, কী সুরের আরোহাবরোহের চড়াই-উৎরাই সিঁড়ি-ভাঙার অবলীলায়িত দ্রুত গতিময়তায় তাঁর এই গানগুলি মৌলিক সুরসর্জনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে রইল। 'ফুলের দিন হল যে অবসান' (জয়জয়ন্তী), 'নবারুণরাগে তুমি সাথী গো' (ভৈরবী), 'শেষের গানটি' (ঠুংরি), 'আলোকলগনে' (রামকেলি), 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' (ভৈরবী ঠুংরি), 'তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি' (দেশী টোড়ি) প্রভৃতি গান একবার যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তা জীবনেও কখনও ভুলতে পারবেন না—এমনি সেসব গানের মনোরঞ্জিনী শক্তি। 'আলোকলগনে' রামকেলির গানটিতে সরগম আর বোলতানের বিস্তার যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন গায়ক হিসাবে ভীষ্মদেবের কৃতিত্বমহিমা কোন্ পর্যায়ের ছিল। অথবা, 'নবারুণরাগে' গানটিতে তিনি যেভাবে আস্থায়ীর মুখে আসবার সময় ভৈরবীর সঙ্গে বিলাসখানি টোড়ির সুরভঙ্গি এনে মিলিয়ে সুনয়ন মুখপাত ধরেছেন ভৈরবীতে, তার মাধুর্যের কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে?

ভীষ্মদেব বাংলাদেশে একজনই হয়েছেন, তাঁর আর কখনও দোসর মিলবে না। অন্য কোন গায়কের সঙ্গে তাঁর তুলনাও করা চলবে না। হয়তো আমার এ কথায় কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন হয়ে গেল, কিন্তু অতিরঞ্জন ছাড়া কি কখনও গানের অনুরাগকে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করা যায়? শিল্পকলা-গুলির মধ্যে সংগীত সর্বোৎকৃষ্ট এই কারণে যে, তার ভাল লাগাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত শব্দ-সম্ভার প্রচলিত ভাষারীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষার অতিরঞ্জন কিংবা শব্দের অতিরেক ছাড়া বুঝি গানের প্রীতিকে লোকসমক্ষে জানান দেওয়া যায় না।

অথচ ভীষ্মদেবের কণ্ঠের এই স্ফূর্তি, দ্যুতিময়তা বা পূর্ণতা একদিনে সংসাধিত হয়নি। ধীরে ধীরে, বিবর্তনের স্তর বেয়ে তাঁর কণ্ঠের সুরসৃষ্টির ক্ষমতা ক্রমোন্নতি লাভ করেছে ও পরিণতিতে একটি সর্বতোভদ্র উৎকর্ষের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্মগত ত্রুটির কথা আগেই বলেছি, এবং এই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের কণ্ঠচাঞ্চল্য। তিনি গোড়ার দিকে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-সমস্ত গান করেছেন (যথা, মুখ মোড় মোড় মুসকাত জাত—মালকোষ; আজ আওরী সখী আনন্দ—আশাবরী; আই বাহার—বাহার হিতাল; ফুলবনকো গেঁদান ম্যায়কো—দেশী টোড়ি; এরি ফিরত সজন—জৌনপুরী; পিউ পিউ রটত পাপহরা বোলে—ললিত; অবহো লালন ম্যায়কো—বেহাগ; এরি মেরে কী—সুখরাই ইত্যাদি)—সেগুলির মধ্যে মধ্যলয়ের গতি এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দ্রুতলয়ে পর্যবসিত হয়েছে অথবা তান-কর্তবের শিল্পক্রিয়া এতটাই ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়েছে যে, সুরের স্থিতি ও ধীরতার মধ্যে যে সুরের মাধুর্য সচরাচর নিহিত থাকে তা অনুভব করবার অবকাশও যেন পাওয়া যায় না সেইসব গানে। যেন বড্ড বেশি চপল-চঞ্চল তাঁর অশ্রান্ত কণ্ঠের লীলা। কোথাও যেন তা স্থিতু হয়ে বসবার সুযোগ পাচ্ছে না, কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে উদ্দাম আর উচ্ছল গতিতে। হয়তো গ্রামোফোন রেকর্ডের সংক্ষেপ-পরিধির জন্যই গানের মধ্যে এই চপলতা বা তারল্যের বেগ এসেছিল। কিন্তু স্বভাবের চাঞ্চল্য যে এর সঙ্গে কিছু পরিমাণে মিশেছিল সেকথাও বুঝি অস্বীকার করা যায় না। অথচ পরবর্তী কালে আসরে বসে কিংবা কলকাতা ও বাইরে (যথা, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, ফৈজাবাদ, করাচী প্রভৃতি শহরে) মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে তিনি যে-সকল গান করেছেন তার সঙ্গে রেকর্ডের এই গানগুলির

কতই না তফাত—মেজাজে, বন্দিশে ও লয়ের ধীরতায়। যেমন, গিনি গিনি দেখো (আলাহিয়া বিলাবল); পীরে না জান (মালকোষ); সুকুয়ামে আয় (পুরিয়া); ফাগুয়া ব্রিজ দেখনো কো চলরী (বসন্ত); পিয়া পরদেশী (পটদীপ); বরষণ লাগি বাদরিয়া (মিঞা-কি-মল্লার); ঢোলনে মাঁডে ঘরেআ (ভীমপলশ্রী); তাডে সে লামানে জা (তিলং); এ ছাড়া নটমল্লার, চর্যকৌমল্লার, জলধর-কেদারা, ধানী, পিলুবারোয়াঁ, বিলাসখানি টোড়ি, আড়ানা, রাগেশ্রী, খাম্বাবতী, সুহা, সুঘরাই, পরজ, সোহিনী, মুলতানী, দেশী টোড়ি—কত রাগ-রাগিণীর হিন্দুস্তানী খেয়ালই যে তিনি গাইতেন তার আর ইয়ত্তা নেই। তাঁর তানের সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সরগম সৃষ্টির অপূর্ব লীলালাবণ্য। বোধহয় সরগম সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি শিল্পী সারা ভারতে স্থিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তেমনি ছিল তাঁর হারমোনিয়ম বাদনের নৈপুণ্য। এ এক আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, গলায় তিনি 'সাপট'-জাতীয় যে-সমস্ত ক্ষিপ্র তান করতেন তার প্রত্যেকটি দানা তিনি তাঁর হারমোনিয়মের স্বরক্ষেপের মধ্যে অবিকল ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। এ যে কত বড় দক্ষতা তা যাঁরা হারমোনিয়ম নিয়ে নাড়াচাড়া করে থাকেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন।

ভীষ্মদেব আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি স্বর্লোক অর্থাৎ স্বরলোক বা সুরলোকে চলে গেলেন। সুরের মানুষ সুরে লীন হলেন। আমরা যাঁরা পিছনে পড়ে আছি, তাঁরা তাঁর তিরোধানে বিষাদময় আক্ষেপই শুধু করতে পারি, আর কিছু করতে পারি না।

অবারিত

সুধাংশু ঘোষ

আকারে ছোট হলেও খেলার মাঠের মতন খানিকটা খোলা জায়গা। কোথাও অবশ্য ঘাস নেই, উদম ধুলোমাটি। চারপাশে বাড়ি। তার মধ্যে আমাদের তিনতলা বাড়িটা সব থেকে উঁচু। উত্তর দিকের একতলা বাড়িগুলোর টিনের চাল। সেই দিকেই মাঠের পাশে একটা টিউবওয়েল। তার জল বেয়ে বেয়ে চলে এসেছে প্রায় মাঠের মাঝখানে। সেই জলকাদা মেখে বেশ ভারী হয়েছে বাতিল টেনিস-বলটা।

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে শীতের বেলা। তাই হয়তো আমাদের খেলায় এমন তীব্র গতি এসেছে। ক্রমে আলো ফুরিয়ে যাবে, সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসবে চারদিক থেকে, তখনো আমাদের খেলা চলবে। অবশেষে সত্যি অন্ধকার নামলে খেলা বন্ধ। সময় কম, শীতের বিকেল ফুরিয়ে যাবে এখনই, তার আগেই বোঝাপড়া করে নিতে হবে। পৌষের বিকেলে ঠান্ডা বাতাস। তবু আমাদের জুলপি থেকে গাল বেয়ে ঘামের ঝুরি নেমেছে। শুধু নাক যথেষ্ট অক্সিজেন টানতে পারছে না, খ্যাপা ঘোড়ার মতন হাঁ করে ছুটছে সবাই, মুখ দিয়েও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জলকাদা-মাখা বাতিল টেনিসবলটা ওদের গোল থেকে নিমেষে আমাদের গোলের দিকে চলে আসছে।

আমরা এখনো হারছি দু গোলে।

আমি আমাদের দলের গোলকীপার। তাই চারপাশ একটু দেখাটেখার অবকাশ পাচ্ছি। অন্যরা বিশ্বচরাচর ভুলেছে। শীতের বেলা, হাতে বেশী সময় নেই, শেষ বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

বাতিল টেনিসবল নিয়ে আমরা ফুটবল খেলছি, অথচ আমরা অনেকেই আর ছেলেমানুষ নই, অন্তত দশ বছর পেছনে রেখে এসেছি এই ধরনের খেলার বয়েস। দু দলেই এমন কয়েকজন অবশ্য আছে যাদের বয়েস পনেরর এদিক-ওদিক। তবে আমরা অনেকেই আর ওদের মতন ছেলে-মানুষ নই, আমরা পুরোপুরি যুবক। মাসখানেক হল ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা মেতেছি এই খেলায়, রোজ বিকেলে। ভোলাদার চায়ের দোকান থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে আমরা এদিকে একটু গুটিয়ে এসেছি।

আমাদের দলের সব থেকে তেজী ঘোড়া আমার ছোট ভাই সুবীর। আমাদের ক্ষিপ্রতম স্ট্রাইকার। দু গোলে পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের তিনতলা বাড়ির ছাদের রেলিং থেকে, উত্তর দিকের বাড়িগুলোর টিনের চাল থেকে পিছলে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। খানিক পরে জলকাদা-মাখা বলটা আর ভালো করে দেখা যাবে না। আমরা জানি, তার আগেই সুবীর গোল দুটো শোধ করে দেবে, আরো বাড়তি গোল দিয়ে জিতিয়ে দেবে আমাদের।

সুবীর তিন বছর আগে কলেজ ছেড়ে মিলিটারিতে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। সেখানে কী সব কান্ড করে আবার ফিরে এসে কলেজে ঢুকেছে। আমি বি-এ পাস করে চাকরি না পেয়ে আইন পড়ছি। সামনে শেষ পরীক্ষা। পাস করলে কোনোদিন কালো কোট পরে আদালতে যাব ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, হাসি পায়। আমার আর-এক ভাই বি-এসসি পাস করে নতুন ব্যবসা করছে। আমরা এই তিন ভাই খেলায় নেমেছি। দাদা শুধু খেলছে না। ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে মেশে না তেমন। তার বিয়ের কথা চলছে। বাবার চাকরি বিদেশী সওদাগরি অফিসে। আমরা চার ভাই পাড়ার চারটি রত্ন। মা'র আদরের ভাষায় চারটি দৈত্য। পাড়ার কারো বিপদটিপদ

হলে সবার আগে আমদের ডাক পড়ে, যে-কোনো উৎসবে আমরাই অগ্রণী, অন্য ছেলেরা আমাদের ছায়া।

বেলা যে পড়ে এল, এখনো গোল শোধ হল না। এবাড়ি-ওবাড়ির ছাদে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা যুবকদের ছেলেমানুষি খেলা দেখছে। আমি পুব দিকের গোলে। বেশ খানিকক্ষণ শুধু দেখছি, বল আটকাতে ব্যস্ত নই, আমাদের দিকে চাপ কমে গেছে। মাঠের পশ্চিমে ওদের গোলে নাড়ু। আমাদের স্ট্রাইকারদের হামলায় পাগলা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাড়ু কয়েকটা অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে। তারিফ না করে পারি না।

আমাদের স্ট্রাইকার সুবীরের গোল করার একটা মোক্ষম কায়দা আছে। সব বাধা ডিঙিয়ে গোলকীপারের মুখোমুখি হতে পারলে বলটা আঙুলের খোঁচায় একটু শূন্যে ভাসিয়ে নেয়, তারপর মারে। ব্যাপারটা নিমেষে ঘটে যায়। বুলেটের গতি পায় বলটা। গোলকীপার ভয়ে সরে যায়। লাগলে দাঁত নাক চোখ সত্যি জখম হতে পারে। সুবীরের বিরোধী দলের গোলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আমার; কানের পাশে বুলেটের শিস আমি শুনেছি।

কোমরে হাত রেখে তেমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম। আমার ঘাম শুকিয়ে এসেছে। হাওয়ার একটা ঝাপটা এল। বুঝতে পারলাম, শীতের বিকেলের ঠান্ডা বাতাস। নাড়ুর পক্ষে কেমন অশুভ মনে হল সেই এলোমেলো হাওয়া। আমাদের সব থেকে তেজী ঘোড়াটা দেখলাম নাড়ুর দিকে উড়ে যাচ্ছে। বলটা মাথায় বুকে পায়ে সেঁটে নিয়ে সুবীর ডাইনে-বাঁয়ে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সব বাধা পেরিয়ে একা নাড়ুর মুখোমুখি হল। আঙুলের খোঁচায় বলটাকে ফুটখানেক ওপরে ভাসিয়ে নিল, তারপর মারল। গোল ছেড়ে সরে গেল আতঙ্কিত নাড়ু।

পশ্চিমের গোলপোস্টের পেছনে একটা আকাশ-ছোঁয়া নারকেলগাছ, ধনুকের মতন বাঁকা। সেই গাছে ঠেসান দিয়ে একা ঝুটকি আমাদের খেলা দেখছিল। অন্য মেয়েরা চারদিকের বাড়ির ছাদে অথবা বারান্দায়। ঝুটকি একা মাঠের মধ্যে নারকেলগাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে এত কাছ থেকে আমাদের খেলা দেখছিল। নাড়ু সরে যেতে বলটা বুলেটের বেগে ঝুটকির বুকের মাঝখানে গিয়ে লাগল। পুব দিকের গোলে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট দেখলাম, ঝুটকির বুকের ঠিক মাঝখানে জলকাদার গোল দাগ।

সুবীরের চিৎকার শুনলাম, 'অ্যাই ঝুটকি, এখান থেকে সরে যা!' তার গলা খ্যাপা ঘোড়ার হ্রেষার মতন মনে হল।

ঝুটকি নড়ল না। নারকেলগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বুকে আঘাতের প্রদর্শনী, কিন্তু মুখে কষ্টের ছায়া নেই। বরং সানন্দ স্বীকৃতির ভঙ্গি।

বাতিল টেনিসবল এমনিতে তেমন ভারী নয়। তবে আমাদের বলটা রোজ জলকাদা শুষে ওজন বাড়িয়ে নিয়েছে। মোটা চামড়ায়ও জোরে লাগলে জ্বালা ধরে যায়। আমি গোলকীপার, আমি জানি।

ঝুটকি ছেলেমানুষ নয়। টিউবওয়েলটার লাগোয়া টিনের বাড়ির পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে, বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেছে। দারুণ ফরসা, শরীরে স্বাস্থ্যের ঢল নেমেছে, তবে পুরু ঠোঁট, ভোঁতা নাক, বোকা-বোকা মুখ। শৈশবে চুলের কোনো বিচিত্র বিন্যাসের জন্য পাড়ায় ডাকনাম হয়েছিল ঝুটকি।

ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা সম্প্রতি এই খেলায় মেতেছি। ফুটবল খেলার পোশাক নেই আমাদের কারো। কেউ আন্ডারওয়্যার, কেউ পাজামা, কেউ ট্রাউজার্স হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে আমরা মাঠে নেমে যাই। কারো গেঞ্জি, কারো হাওয়াই-শার্ট পরা, কারো শীতের বিকেলেও খালি গা।

কারো ধার-করা হাফ প্যান্ট সেলাই বরাবর ফেঁসে যায়। লোমশ বুকে ঘাম জমে, উরুদেশ বেয়ে ঘামের স্রোত নামে, পেশী ফুলে ওঠে। লিকলিকে পেন্সিলের মতন খেলোয়াড় অবশ্যই আছে, যেমন আমাদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটা, তবে আমরাও আছি, দস্যুরা। এত কাছে একা দাঁড়িয়ে কী খেলা দেখতে আসে ঝুটকি? কী দ্যাখে?

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখানো ঝুটকির বাবা পার্বতীচরণের পেশা। এখন চোখে মোটেই দেখতে পান না, কোথাও যেতে পারেন না। দুচারজন ছাত্রছাত্রী আসে, রাগপ্রধান গান শেখে। ঝুটকির ভাই মোহন কিছু কাজটাজ করে না। দিদির মতন ফরসা, লম্বা, ভালো স্বাস্থ্য, কিন্তু মাঝেমাঝেই হন্যে হয়ে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজের কপাল ফাটায়, নিজের রক্ত দেখার পর অন্যদের রক্ত দেখতে চায়। বালতি, দরজার হুড়কো ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির লোকদের মারে। তখন অমানুষিক শক্তি আসে তার গায়ে। মা'র আদরের দৈত্যদের ডাক পড়ে। আমরা বাড়ি থাকলে দৌড়ে যাই, মোহনকে চেপে ধরি, একজন পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে। ইঞ্জেকশন খেয়ে মোহন ঘুমোয়। পড়ে থাকে কয়েক ঘণ্টা, যেন জ্যান্ত নয়, একটা লাশ।

অন্য সময়ে যখন ভালো থাকে, মোহনের খুব অহঙ্কার। তবলায় ঠেকা দিতে পারে, নিজেকে বলে বেতারশিল্পীর ছেলে। তিরিশ বছর আগে পার্বতীচরণ নাকি একবার রেডিওয় গান করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নামের সঙ্গে বেতারশিল্পী কথাটা সেঁটে গেছে।

মোহন আমাদের মাঠে দৈবাৎ খেলতে নামে। আজ নামেনি। আমাদের সঙ্গে মেলামেশাও করে না তেমন।

ঝুটকিকে আমাদের বাড়িতে দেখা যায় যখন-তখন। নিতান্ত অসময়ে ও মা'র পেছনে ঘুরছে, কী সব আরজি রাখছে ফিসফিস করে। আঁচলের তলায় কিছু লুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যেতে দেখেছি। তখন সামনে পড়ে গেলে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়, চোখের দিকে তাকায় না, কথা বলে না। তখন ঝুটকিকে দুঃখী মনে হয় বলেই হয়তো ততটা আর বোকাবোকা লাগে না।

আজ সুবীর একটা গোল শোধ দেবার পরও আরো পনের-কুড়ি মিনিট খেলা হল। কিন্তু অন্য দিনের মতন সুবীরের শেষ সময়ের তেজ আজ দেখলাম না। গোলের কাছে গিয়েই কেমন ঢিলে হয়ে পড়ছে, বল কেড়ে নিচ্ছে ওদের খেলোয়াড়রা। আমরা এক গোলে হেরে গেলাম।

তখনো নারকেলগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঝুটকি দাঁড়িয়ে। পুব দিকের গোল থেকে দেখলাম, পশ্চিমের গোলপোস্টের পেছনে ঝুটকির শরীরের তীক্ষ্ম প্রান্তরেখা আবছায়ায় ভাসছে।

কয়েক দিন খেলা তেমন জমল না। বড়দের ছেলেমানুষি নেশা কেটে যাচ্ছিল। তার মূল কারণ সুবীরের উৎসাহে কমতি। সুবীরই আমাদের এই খেলায় মাতিয়েছিল। সে-ই পিছিয়ে গেল। তাছাড়া ভোলাদা আবার আমাদের ডাকছিল, আদর করে ডাকছিল তার চায়ের দোকানে। সুতরাং উদম ধুলোমাটির ছোট মাঠে শুধু ছোটরাই রয়ে গেল বাতিল টেনিসবল পেটাতে।

ভোলাদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আমরাই রাজা। মাঝে আমরা একটু সরে গিয়েছিলাম। এর জন্য দায়ী ডিগডিগে গৌতম ছেলেটা। ছেলেটা বললে মানায় না, গৌতমের প্রায় আমার বয়েস। দেবাশিস সরখেল নামে একটা লোক আছে, খুব চালু। ঠিক আমাদের পাড়ার লোক নয়। আমাদের গলির বাইরে বড় রাস্তায় ফ্ল্যাটবাড়িতে ভাড়া থাকে। বছর পাঁচেক হল এদিকে এসেছে। তার বোনটা কলেজে পড়ত। বোনটার বিয়ে ঠিক হলে গৌতম গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নেড়ে সরাসরি সরখেলকে বলে এসেছিল, অন্য কোথাও বোনের বিয়ে দিলে বিয়ের রাত্তিরেই বোন বিধবা হবে। এই কাণ্ড করার আগে গৌতম আমাদের কাউকে কিছু বলেনি, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি। গৌতম নিশ্চয়ই জানে, এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। পাড়ায় আর যা-ই হোক,

আমাদের সুনাম আছে। তাই হয়তো গৌতম একা গিয়ে ওই নাটক করে এসেছিল। আমাদের সমর্থন পাবে না বুঝেই একা গিয়েছিল।

পরদিন থেকে পুলিসের দুতিনটে সাব-ইন্সপেক্টর ভোলাদার দোকানে জমিয়ে বসল। এদিকের থানার কে নাকি সরখেলের দোস্ত। পুলিস আমাদের ওপর নজর রাখবার জন্য এসেছে বুঝেও পুলিস দেখেই আমরা সরে আসিনি। দুটো সাব-ইন্সপেক্টর আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি, বলাই বাহুল্য। গৌতমের ওপর আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম সত্যি, তাকে একটু কড়কেও দিয়েছিলাম, তবে আমাদের আসল রাগ অথবা ক্ষোভ অথবা অভিমান ভোলাদার ওপর। পুলিস পেয়ে গিয়ে ভোলাদা আমাদের যেন ভুলেই গেল। সব সময় পুলিসের দিকে লক্ষ্য। আমাদের কোনো পাত্তা নেই। আমরা যেন উটকো লোক। বিকেলে ভোলাদার দোকানে একটা ফিশ রোল তৈরি হয়। তেলাপিয়াফিয়া দিয়ে বানায় হয়তো। কিন্তু খেতে ভালো, আর খুব সস্তা। বাইরের লোক ভোলাদার দোকানে বিশেষ আসে না। ফিশ রোল আমরাই খাই। একদিন বিকেলে আমরা একটাও ফিশ রোল পেলাম না। ভোলাদা আহ্লাদে গলে গিয়ে জানাল, পুলিস সেদিনের সব ফিশ রোল নিয়ে নিয়েছে। থানার মধ্যে কোয়ার্টার আছে তো।

ঘেন্নায় আমরা ভোলাদার দোকান বয়কট করেছিলাম, খেলায় মেতেছিলাম ছোটদের সঙ্গে।

সরখেলের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি। আমরা নেমন্তন্ন চাই-ওনি। মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে শ্বশুরবাড়ি জব্বলপুরে চলে গেছে। গৌতম নিজের পকেট ফাঁক করে অন্যদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে অবিরাম চারমিনার ফুকছে।

পুলিস সরে গেলে ভোলাদা আমাদের আদর করে ডাকল। বলল, 'তোরা আমার চিরকালের। তোরা না এলে দোকান তুলে দেব।' বেহায়া গৌতমটা ছাড়ল না, ফিরে এসে বেঞ্চিতে পা গুটিয়ে বসে ভোলাদাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল, 'এদিকের থানার পুলিসদের পাগুলো হঠাৎ ফরসা হয়ে গেছে দেখলাম। পুলিসের পা চাটল কে রে?'

ভোলাদা বুঝতে না পারার ভান করল।

ইতিমধ্যে সরস্বতী পুজোটা এসে গেল। সব দায়িত্ব আমাদের। চাঁদা তোলা, মাঠের আধখানা জুড়ে প্যান্ডেল বাঁধা। নাওয়া-খাওয়ার সময় রইল না। আমরা জানি, এইসব অনুষ্ঠান এলে শেষের সপ্তাহটা যেন উড়ে চলে যায়, ঝড়ো হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মতন। শেষ সপ্তাহটায় ভোলাদা বেশী করে ফিশ রোল ভাজছিল।

পুজোর দিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে খিচুড়ি হয়েছে। ঝুটকিদের আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। বাবার সঙ্গে দাদা আগে খেয়ে নিয়েছে। একটু বেশী বেলায় ঝুটকি, মোহন, ঝুটকির ছোট দুই বোন আর আমরা তিন ভাই খেতে বসেছি আমাদের দোতলার রান্নাঘরের সামনের চওড়া বারান্দায়। ঝুটকির মা-বাবার খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে নেমন্তন্ন বলে ওদের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ঝুটকি সকাল থেকে আমার মাকে নানা কাজে সাহায্য করেছে।

পুজো শেষ। সবার মেজাজ ভালো। খেতে বসে গল্পটল্প হচ্ছিল। ঝুটকি হঠাৎ একটা কথা বলে দারুণ চমক দিল। বোকা-বোকা গলায় ঝুটকি বলল, 'মাসিমা, সেদিন খেলতে-খেলতে সুবীর সবার সামনে আমাকে ঝুটকি বলল কেন? আমাকে অরুণিমা বলতে পারত না?'

ডেকচিতে হাতা ডুবিয়ে মা চুপ। সুবীর হাঁ করে আছে, মুখের দু ইঞ্চির মধ্যে গ্রাস।

মনে পড়ে গেল, ঝুটকির এমন একটা পোশাকী নাম আছে। বেতারশিল্পী পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে অরুণিমা।

একটা ঘটনাও মনে পড়ল। সুবীর বাতিল টেনিসবল মেরেছিল ঝুটকির বুকের মাঝখানে। সে তো দেড় মাস আগের ব্যাপার। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জলকাদা-মাখা টেনিসবলের সেই দাগ নিশ্চয়ই এতোদিন নেই, ধুয়ে মুছে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম, ঝুটকি নিমেষের জন্য তার বুকের কপাট খুলে দিয়েছে। ওপরের দাগ মুছে গেলেও ভেতরে দগদগ গোল দাগটা তখনো স্পষ্ট।

মনে পড়ে আলফান্সো

অসীম রায়

মনে পড়ে আলফান্সো কি সূর্যাস্তের রঙে রাঙা আরক্ত মাস্তুলে
তুমি আর আমি
সামনে দোলে আসমুদ্র আফ্রিকা এশিয়ার সূর্যোদয়
অজস্র বন্দরে
লুয়ান্ডা কি নাগাসাকি
মোজাম্বিক গোয়া থেকে মালাবার মালাক্কা ম্যাকাও
আমাদের ছুটন্ত ব্যারাকে
মৌসুমী হাওয়ার আর্তনাদ
মনে পড়ে?

আলফান্সো নিশ্চয় তুমি ভোলনি সে আফ্রিকার প্রজ্বলিত গ্রাম
সপ্পো সপ্পো লেলিহান আমাদের লালসার শিখা
ফিন্‌কি-ছোটা হাহাকার মিলাতে না মিলাতেই
স্বর্ণপেটি আসে কাঁধে জাহাজের খোলে।
কে পারে সে আমাদের দুর্বার অভিযান
রুখে দিতে
নিগ্রো দলপতি থেকে মিঃ সম্রাট
কেউ না কেউ না
শৌর্যে বীর্যে আমরা প্রত্যেকেই দৃপ্ত আলবুকার্ক
সে কাহিনী আজ নেই কেপ-অব-গুডহোপে
ভারতসাগরে।

আলফান্সো আমাদের ছুটন্ত ক্যারাকে
আরবী ঘোড়ার হ্রেষা
মালাবারী গোলমরিচে গন্ধে ভরপুর বর্ষাকাল
সমস্ত হেমন্ত আনে দারুচিনি দ্বীপের গন্ধ
রুপো আনে নাগাসাকি শীতে।

আলফান্সো ভেবেছি আমরা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে
থাকব নিশ্চয়
তুমি আর আমি
চেয়ে আছি জলে ভেজা কয়েকটা পাথর
আফ্রিকার উপকূলে গোয়া মালাক্কায়

কেউ যদি জ্বালে মোমবাতি,
বোধ হয় আলফান্সো ওরা আজকাল অন্য কিছু চায়
অন্য কিছু পরিস্থিতি যেমন এ পৃথিবী
যদি আরও বাসযোগ্য হয়॥

আবহমান

রফেশ্বর হাজরা

সমস্ত স্বাধীন ভেবে নিতে পারি এতো স্বাধীনতা আমাদের নেই
আছি বিপরীত কার্যকারণে এবং সন্তর্পণে
আছি প্রতিদিন রুক্ষ দিন অবসানে
প্রত্যহ জানাতে হয়—ভালো আছি আর
পেয়েছি সমস্ত শস্য ইন্দ্রের কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা!
কোন্ শস্য সত্যি আমাদের!

আছি চতুর্দিকে বহু দুর্গন্ধ হাওয়ার মধ্যে বড়ো বিরক্তির
ধুলোয় আচ্ছন্ন বাতাবরণে এবং রুচিহীন
শব্দে প্রতিদিন ক্লান্ত দিন অবসানে—
অথচ জানাতে হয়—এই ঠিক এই কাম্য ছিল—আর
পেয়েছি সমস্ত যজ্ঞ অগ্নির কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ যজ্ঞ সত্যি আমাদের!

চলেছি মন্থর পায়ে উটের গতিতে (ভারি বোঝার ক্লান্তিতে)
হঠাৎ চাবুকে নগ্ন অশ্ববেগে কখনো বা
গাধার প্রচণ্ড ধৈর্যে—সহিষ্ণু শিক্ষায়—বোকা
লুকোনো আক্রোশে হাহাকারে.....
অথচ জানাতে হয় এই ঠিক আরো ভার দাও প্রভু, দাও
পেয়েছি সমস্ত মুক্তি তোমার কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ তুমি মুক্তির দেবতা!
কোন্ মুক্তি সত্যি আমাদের!

পতঙ্গ পিঞ্জর

শওকত ওসমান

নামে কিছু আসে যায় না, যারা বলে, তাদের বস্তু-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা বহুত। এখানে অবিশ্যি মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম, সুরত মণ্ডল প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি ছিল কোন অজ্ঞাত জীবের নামকরণে, বিশেষত তা যদি দৈবাৎ এসে পড়ে। এক-এক জনের লম্বা ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক সময়ের অপব্যয় এবং তারপরও ব্যক্তির সীমানা ডিঙানো যাবে কিনা, তার নিশ্চিন্ত আশ্বাস কোথায়? তাই সকল প্রশ্নের একমাত্র জবাব দেওয়ার রীতি অনুসারে বলা যাক, ওই জীবের নাম পঙ্গপাল এবং তা মানুষের মতো দলবদ্ধ জীবন যাপন করে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ঝরনার লাফিয়ে-লাফিয়ে চলাকালে জলের ফেনবিন্দুর বিস্তার-লীলার সঙ্গে হাজার হাজার উড্ডীন মরালের সন্ধান পেয়েছিলেন। পঙ্গপাল এমন কায়দায় ওড়ে না। একথা যেমন সত্য, তার দলবদ্ধতার হদিসও তেমন সত্য। জীববিশেষজ্ঞদের মতামত পরে দেওয়া যাবে। তা পূর্বে থেকে বলে রাখা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়—তাছাড়া অন্যান্য বিকল্প অসম্ভব। একটা জিনিস আমরা যে-যার-মতো ধারণা করে নিতে পারলেই তো আর বৈশিষ্ট্যের অদলবদল হয় না। এমন ঘটলে স্বর্গ-রচনা এত সহজ হয়ে পড়ত যে তখন নিষ্ক্রিয় মনের লাগাম খুলে দিলে কাম ফতে, যদিও বা কী ঘটল তা বোঝার মতো তোমার শক্তি গায়ে হতে পারে। ফলাফলের এমনতর উৎপাত বিধায় তুমি আমি সকলে এক ঘাটে এসে পৌঁছাই এবং একে-অপরকে চিনতে পারি। নচেৎ ভাসতেই থাকতাম যেমন আবেগ ভেসে যায় নিজের টানে যখন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো বুদ্ধির আহ্বান পেছনে খমখা গর্জায়।

ক্রমে ক্রমে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল হাতের চেটোর মতো, যেখানে আর সূর্যের আলোয় বাধা পড়ে না। এতদিনে সকলে যা মনে করেছিল ছায়া-শীতলতা, তা আকাশের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সূর্যকে ঠেলে দিতে লাগল ক্রমশ উত্তাপের পথে। এসব নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সেজন্য কারো কোনও উদ্বেগ ওৎপাতা বাঘের মতো ঝম্প দিয়ে উঠবে, তেমন কিছু হতে পারে না। বিপদের মাত্রা পরিষ্কার হয়ে উঠল যখন দৈনন্দিনতার পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখা গেল, চতুর্দিকে লিকলিকে সাপ কিলবিল-মত্ত।

তাদের গ্রামের বাইরে মানুষ আছে, গফুর সব সময় শুধু প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত না, বরং আরো মনে করত যে আক্কেল বুদ্ধির ব্যাপারে দশজনকে জিজ্ঞেস করাই ভাল এবং তা কেবল গোড়গ্রামে আটক রাখা অন্যায় ও ডাহা মূর্খতা। অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক অসুবিধা ঘটেছে, অনেক বচসা শুরু হয়েছিল ঘরের মধ্যে পাড়ার মধ্যে, দুই দলের মধ্যে—এমন-কি একই দলের শাখা-উপশাখার ভেতর। গফুর তার গাড়ি জুতেছিল। সফরের উদ্দেশ্য পেছনে যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আরো দশজনের কাছে সে জানবে : তার মতো মূর্খ মানুষেরা যখন কিছুই বোঝে না তখন তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে—এমন মানুষের নাগাল কোথা পাওয়া যায়? বউ সখিনা মনে করত বাড়ির আঙিনার সীমানাই দুনিয়ার সীমানা হওয়া উচিত এবং একান্ত যদি তা না ঘটে, খুব-জোর পাড়া পর্যন্ত যথেষ্ট, না হলে গ্রামের চৌহদ্দিই চৌদ্দ ভুবন, দশদিগন্ত। তাই নারী-বিবর্জনের গুরুবাক্য স্মরণ রেখে গফুর এক অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়েছিল পীর-পয়গম্বরদের নাম মুখে এবং দরুদ (মন্ত্র) জপে-জপে। ফৌত্ পিতার আত্মা তার সঙ্গী ছিল কিনা, জানা না গেলেও,

এই অনুমান মিথ্যা নয় যে সে জনকের অসহায় অপমৃত্যু আজও ভোলেনি এবং সেইহেতু বলদের পাঁচন বাড়ি কষাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল অবোলা জন্তুর প্রতি অনুকম্পাবশত, যা পিতার জন্যে প্রথমে উৎসারিত এবং প্রাণীর উপর অর্পিত। কিন্তু গ্রামসীমানার শেষে গোরুগুলো হাঁপিয়ে উঠতে লাগল এবং অনিচ্ছাকৃত একটা চাবুকেও আর এগোতে নারাজ, সোজা মুখ থুবড়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। পতঙ্গ উড়ছিল চতুর্দিকে শত, হাজার এবং পর্যায়ে পর্যায়ে যতই এগোও সংখ্যার পরিধি বর্ধমান। পাতলা কুয়াশা ক্রমশ ঘন হওয়ার কালে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও আবছা কিছু দৃষ্টিগোচর অন্তত জানান দিয়ে যায়। তারপর আর নিজেকেও দেখা তো যায়ই না, বরং ভীতির ধাক্কা বাড়িয়ে দেয় যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান-সম্পর্কে সচেতন হও, কিন্তু তা আর চোখের প্রতিবেশী নয়। হাত আছে নাড়ছ। অথচ নেই। এই চেতনায় নিজেকে প্রেতাত্মা বানাতে হয় স্রেফ বায়ুবীয় আকারে নয়, বরং বাস্তব কাঠিন্যে—যা মৃত্যু সন্নিকটে করে। গফুরের বুকের পাটা সুমেরু-কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা, তা নিয়ে ফায়সা তর্ক একটা না তুলেও সিধান্তে আসা যায়, সে দম থাকতে কম করেনি। হাজার হাজার পোকা যখন এপাশ-ওপাশ-রত ঠোক্কর খাচ্ছিল তার গায়ে বুকে মুখে, সে নতমুখ গোরুর গলার দড়ি ঠিক রাখছিল। হে-হে-শব্দ যথাসম্ভব অব্যাহত। কিন্তু অবলা জীবের উপর যতই নিষ্ঠুরতা দেখাক সে, তাদের 'জান্' জিভে এসে ঠেকছিল। গফুর ভাবে, যদি মাঠের ঠিক মধ্যিখানে তার বাহন আর এগোতে না পারে এবং গোরু দুটো মরে যায়, তখন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকার (সুরত মণ্ডলের কাছে শোনা) দশা হবে। তখনও সময় বাগে, আয়ত্তের ভেতর এবং হুঁশিয়ারি হেঁকে যাচ্ছিল, 'তফাত যাও, পালাও, দুঃসহ দেখিও না।' বলদ দুটো ঈষৎ আস্কারার প্রত্যাশায় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, দড়ি একটু ঢিলা করা মাত্র। দুই প্রাণী একদৌড়ে একদম গাঁয়ের সীমানার মধ্যে—যেখানে নিরাপত্তা শতে শত না হলেও তিরিশ। গফুর একবার ভেবেছিল, সবাই মিলে, পোকাগুলোকে পিটোলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল মোহাম্মদ আলী এবং মসজিদের ইমামের কথা : কিসে কী হয় তা মানুষ অত সহজে বুঝতে পারে না। সবুর করে যাও। এগুলো যে ছদ্মবেশী আশীর্বাদ নয়, তার জবাব কে দেবে? তাই গফুর হাঁফ ছেড়েছিল মাদবরের উঠানের ঠিক সামুনাসামনি, যেখানে ছেলেপুলেরা খেলছিল—দুনিয়ায় কোন সমস্যা নেই, এমনই নির্ভাবনায়। একটা জিনিস গাড়োয়ানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আর বাইরের কারো সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটবে এমন সম্ভাবনা কম নয়, অতি দুরূহ।

তখনও গাছপালার সবুজে বিস্তারিত আকারে পতঙ্গের হামলা শুরু হয়নি জেনে পূর্বাভাস-স্বরূপ প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিল গফুর মাদবরের সঙ্গে। অলক্ষুনে কথা মুখে আনতে নেই—প্রবাদটি পরদিন থেকেই গোড়গ্রামে আবার চালু হয়েছিল যেন এতদিন কোনও আশ্তবাক্যের প্রয়োজন ছিল না কারো। মাদবর গ্রামের প্রধান হলেও লেখাপড়াজানা মানুষের কাছে স্বভাবজ বিনয়ে এমন নুয়ে পড়ত যে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ধসে করে দিতেও দ্বিধাহীন। এই নিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল গফুরের মনে এবং তা প্রকাশে ভীরুতা দেখালেও শেষ পর্যন্ত মাদবরের স্নেহাতিশয্যে সে কোন খুঁত পায়নি। অবিশ্যি সে নিজে ভাবতে শুরু করেছিল ধীর-ক্রমিকতায়। যেহেতু গ্রামের বাইরে যেতে না পারলে রুজিরোজগার শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, মৃত্যু সত্বর না হোক ঈষৎ বিলম্বেও তাদের অর্থাৎ গ্রামের তার মতো বহু মানুষের গলা টিপে ধরবে। টিকে থাকার মতো যে-দুচার জন আছে তাদের ধর্তব্যের মধ্যে না-ফেলাই মঙ্গল। ছোটখাট উৎপাত বিরাট অমঙ্গলের বেশে দেখা দিতে কী অনেক-অনেক সময়ের অপচয় লাগে, না তেমন আশঙ্কা অমূলক। যেমন মাদবর তেমনই আরো বর্ষীয়ানদের গফুর ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেছিল বা শুনেছিল। হেন কর্ম গফুরকে বড় উত্তেজিত করে তুলত এবং সে সমবয়সীদের সহজ ভাষায় যা বলত, সাধু ভাষায় তার প্রকাশ, 'রমণ-

কালেই ঘন ঘন শ্বাস দীর্ঘ হয়, যার অর্থ পরবর্তী মুহূর্তে চরম সুখ আসন্ন'। কিন্তু বৃদ্ধের দল কেন শ্বাসপ্রশ্বাসের অমন অমর্যাদা করে, বোঝা দায়। সঙ্গীরা হেসেছিল প্রাণদ হাসি নয়, বরং চেষ্টাকৃত—যা একটা ছুতোর মতো মিথ্যের সঙ্গে অর্থবান বা শোভামণ্ডিত হয়। অবিশ্যি একা গফুর নয়, অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল এই অমঙ্গলের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যে। দিন বসেও থাকে না, শুয়েও থাকে না, যেহেতু চলে। তাই ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার নয়, গতিশীল যন্ত্রের মতো তার সহজ পরিবহণ-ক্ষমতা স্বতঃসিদ্ধ, আবার ঠোক্কর খেয়ে আধার-আধেয় সবই চূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। মাদবর যে এসব ভাবত না, তা নয়ই, বরং সে তার পিতৃমাতৃহীন নাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সব দিন ক্ষণকাল মিলিয়ে দেখত। বর্তমান মাতামহের গলগ্রহ এই ছেলের মাও তার বড় ন্যাওটা ছিল। কন্যার স্মৃতি পুষে আছে বৃদ্ধ সেই কবে থেকে, ছেলেটা যখন কোনরকমে হামা টানত। বর্তমানে আট-ন বছরের ফুটফুটে বালকের আকাশস্পর্শী আবদার মাতামহ রক্ষা করত বিনা বিরক্তি। নতুন ঘটনা নয় এসব এদেশে। তারই জের টেনে চলছিল মাদবর শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। জীবনের সব আগ্রহ নিভে গেলে ছোট গণ্ডীর উপর মন ঝাঁপিয়ে পড়ে। গফুর এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে অমঙ্গলের প্রসঙ্গে দৌহিত্রকে অনুপস্থিত রাখত না। একটা কথা যেখান থেকে উৎসারিত হোক, হোঁচট খেয়ে ঠেকে গিয়েছিল একটি মাত্র সিদ্ধান্তের গর্তে : আর কেউ গ্রামের বাইরে যেতে পারবে না।

মোহাম্মদ আলীর নিকট বার্তা পৌঁছলে সে প্রথমে তা হাসির হাওয়ালায় সঁপে আরো তন্নিবেশ কাব্যচর্চায় মন দিয়েছিল। যা ঘটে তা সত্য নয়। এই আপ্তবাক্য এবং কৌতূহলের আবেশে অন্যমনস্ক কবি অবহেলায় থুতনির উপর আরো তিনগাছা দাড়ি পর্যন্ত গজিয়ে ফেলেছিল। যেহেতু তিনের বাইরে যেতে চাইলে ওই মাকুন্দ-মুখে ঝোপের সম্ভাবনা স্বপ্নমাত্র।

সাত

সশব্দ কান্নার মধ্যে কতো রকম ফারাক থাকতে পারে, তার হদিস অনেকে ওলটপালট করে দেখতে অনভ্যস্ত। এখানে স্বতঃসিদ্ধ এবং চিরাচরিত সিদ্ধান্ত সব একাকার করে দেওয়ার মূলে সেই ইচ্ছাই বলবৎ থাকে যে সর্পাঘাত যদি শিরেই হয়ে থাকে, তখন গণ্ডদেশ না গর্দানের পাশে, তা নিয়ে আর কূটকচাল তর্ক তুলে মুনাফা কী? কিন্তু উন্মাদকুল যদি মনঃসমীক্ষণবিশারদ হত, তাহলে পাগলামি সেরে যেত, এমন কথা কেউ হলফ-সহ বলতে পারে না। তবে সম্ভাবনা যখন বর্তমান, আশা পোষণ বা বিশ্লেষণ করতে কারো অনীহা থাকা অনুচিত। অন্যপক্ষে, নীরব কান্না যা কেউ শোনে না বা যার লক্ষণ অশ্রুবর্ষণকারীর অবয়বে পর্যন্ত অনুপস্থিত, তখন সমস্যা জটিল। অথচ রাস্তার মোড় বা মোচড় ইত্যাদির মতো সব কান্নার জল শেষ পর্যন্ত এক গন্তব্যে পৌঁছলেও, তাদের গতিপথ জানান দেবেই সূত্রপাতের ধারাটা কেমন। গোঁড়গ্রামের দুঃখী মানুষরা চিরদিন উর্ধ্বপানে মুখ তুলে ফরিয়াদে অভ্যস্ত বিধায় দেখা গেল, যখন আকাশ থেকে গজব (অভিশাপ) নাজেল (অবতীর্ণ) হয়েছে তখন তার মধ্যে অস্বাভাবিক কেউ কিছু দেখেনি। কাঁদতে হয়, কান্নায় কান্নায় চোখের মণি গলা সীসার মতো বুকপথে দরদর নামিয়ে দাও। কেবল চক্ষু উপরের দিকে সোজা রাখো। অপিচ তুমি দৃষ্টিহীন। কিছু আসে যায় না।

অবিশ্যি বুলানের মতো অল্পবয়সী যাদের কাছে অজ্ঞাত, গজব এবং আশীর্বাদ একই স্থান থেকে উৎসারিত কিনা, তারা সীমাবদ্ধ করে নেয় নিজেদের কান্নার ফিরিস্তি। তাদের চোখ আকাশ-পানে যাওয়া দূরের কথা মাটি ছেড়ে যেতেই শেখেনি। অভীষ্ট গন্তব্য সেখানে সংকীর্ণ হওয়ার

ফলে, তার মধ্যে সেই বীজ লুকিয়ে থাকে যা মাটিতে বৃক্ষের মতো সকল শিকড় চালিয়ে দিতে পারলেই খুশী এবং সেই টানেই বৃক্ষের মতো তা আকাশ-ব্রজনার অভীপ্সা লাভ করে। বুলান কেন, যাদের বয়স আরো কম হাঁটি-হাঁটি-পা তারা নিজেরা অঙ্কুর বিধায় মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকতেই বেশি আগ্রহশীল। প্রকৃতির নিয়ম যেমন লতায় পাতায় তেমনই মনুষ্যক্ষেত্রে প্রয়োগক্ষমতা জাহির করে, পণ্ডিতেরা বলেন।

অভাবের সংজ্ঞা দিতে গেলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, এমন মারপ্যাঁচ তারাই ফলাতে পারে, অনটন যাদের স্পর্শ করেনি। শিশু-কিশোররা কিন্তু সহজেই হদিস বুঝার ভার বাইরে থেকে পায়, এমন ঘটে না। বরং তাদের ভেতরেই স্বপনবুড়ো ঠিক উল্টোমূর্তি ধারণ করে, সবক দিতে থাকে এবং পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দিতে তার বেশি বিলম্ব হয় না।

শ্বেতশুভ্র দুগ্ধ।
অমল ধবল পাল।
শ্বেত রাজহংস।
মেরু-তুষার।

গোঁড়গ্রামে কিন্তু কচি ছেলেদের চেহারা সাদা হতে থাকে। চোখের কোণে আর রক্তকণিকা উত্তাল হয় না বা নিচে হাতেই দ্যাখো নখ পর্যন্ত লালিমা হারিয়ে ফেলেছে তলার চামড়ার সমর্থন-অভাবে। এই সময় কল্পনার পাল ফুটো হয়ে যায় এইজন্যে যে মেরু-তুষারের শৈত্য মজ্জা ধরে টান দিচ্ছে, রাজহংস অন্যান্য বন্যহংসের ডানায় হেথা-নয়-হেথা-নয়-জাতীয় প্রচরণশীলতার মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সতর্কতা হিসেবে নয়, বরং বাঁচার ঐশী বাণী-রূপে। কিন্তু বিহঙ্গ যতো দ্রুত নভো-সোপর্দ হতে পারে নিবাস-সন্ধানে, মনুষ্যসন্তান তত সত্বর 'ডেরা পরিত্যাগে যেমন অসমর্থ, বাঁধতেও তেমন অপারগ। মাটির সঙ্গে যোঝাযুঝি যেখানে নিত্যকর্ম সেখানে উর্ধ্বমুখী মেঘ দেখা চলে, তার চত্বরে পা রাখা যায় না। এই জায়গায় কল্পনা দরকার হয়, তা-ও কিন্তু মাটির উপর দাঁড়িয়ে।

ছেলেগুলো সব হাড়-জিরজিরে, ঘোড়া হলে, কেউ পক্ষীরাজ সম্বোধন দ্বারা রসিকতা করত। খড়ের গাদার নিচে পড়ে-থাকা ধানের যে চারা গজায়, তা যেমন বিনা সূর্যকিরণে ফ্যাকাশে, বাচ্চাদের মুখের আদলে সেই রঙ। অথচ সাদা দুধ পেলে সব ধুয়ে ফেলা যেত এত সচ্ছন্দ এবং সহজভাবে যে আর কিছুরই প্রয়োজন হত না। বিষে বিষক্ষয়ের মতো সাদা দিয়ে সাদা তাড়ানোর কৌশল গোঁড়গ্রামে এত অপরিজ্ঞাত যে মগজ খুঁড়লেও কোন চিহ্ন মেলা দুষ্কর। তাই বালকেরা, বালিকারা কাঁদতে লাগল—লাগল—যখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের বুকে কিছু লাগল না কেবল, পেটও জ্বলতে লাগল। অবিশ্যি আবার শক্ত ডাঙায় ফিরে গেলে দেখা যেত, ঘাসের অভাবই আপাতত এই এক জায়গায় নানা সমস্যা গেঁজিয়ে তুলছিল। শস্যশ্যামলা, চিরসবুজ এলাকাগুলো রাতারাতি কখন পতঙ্গ-আক্রমণে ন্যাড়া আচোট জমিতে পরিণত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। গোচারণ মাঠ আর মাঠ নয় যে ধুলো শুঁকেই হিল্লোল-কোকুদ জীবজন্তুর দল নৃত্য শুরু করবে বা আধেয়-ভর্তি স্তনাধার, গলকম্বল নেড়ে-নেড়ে বাড়ির দিকে ছুটবে—গৃহপালিত প্রাণীর যা অভ্যেস। রোমান্টিক ঘণ্টার আওয়াজ চাও সন্ধ্যাগমের অগ্রভাগে, এতদিন যাতে অভ্যস্ত ছিলে স-ঢেকুর, তাহলে তুমি ভুল করবে না—মূর্খতার পরিচয় দেবে। কারণ, আর গোধূলি নেই এবং নেই হওয়ার হেতু : গো-পাল স্ব-স্বভাব হারিয়ে ফেলেছিল যেমন খুইয়েছিল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার এইরূপ রোমান্টিকরা বুঝত ওই ঢেকুরের কাব্যিক সংযোজন হিসেবে, ভরা পেট থেকে যার উৎসারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বুলানরা আর মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে না, প্রায় সদ্য-বিয়োনো চার-পাঁচ দিনের গোরুর

বাছুরের সঙ্গে পাল্লা-দানের ভঙ্গিতেই এতদিন যার তুলনা বিধিবদ্ধ ছিল। এবার বিধি আছেন বটে, তবে বন্ধ করে দিয়েছেন তাবৎ উপাদান যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততা নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত। সবুজ-সবুজ ঘাস, সবুজ-সবুজ দেশ, সবুজ-সবুজ প্রাণ—সব বুজে গেছে অল্পদিনের মধ্যে, যদিও এমন ক্ষেত্রে শতাব্দী মন্বন্তর দশক প্রভৃতি টেনে আনেন ঐতিহাসিকরা। মোহাম্মদ আলী অন্তত ইতিবৃত্তের এই জের তখনও বজায় রেখেছিল, যে মনে করত, সময়ের পরিমাপ অনন্তের মাপকাঠিতেই হওয়া বিধেয়। কিন্তু বুলানরা বে-সবুর কাঁদত অকারণে নয়—জ্ঞাত হেতুর আশ্রয়ে অসহায় এবং অবুঝ।

কবি মোহাম্মদ আলী বলেছিল তার আত্মীয়দের কোন একজনকে যে আবার কথাটা চালিয়ে দিয়েছিল স্বিতীয় কানে এবং এই ধারায় শত-কান হওয়ামাত্র রব উঠল : কামধেনু, কামধেনু। একটা কামধেনু পাওয়া গেলে, শিশু কিশোর অসুস্থ রোগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—তাবৎ সকলের সমস্যা মিটে যেত। মুনি-ঋষিদের কথা কৃষিযুগেই অচল হয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃত ঘটনা আর প্রাকৃত থাকে না, বরং কিংবদন্তীতে পরিণত হয় যা মাদবর অগয়রহ এমন-কি গফুর বা সুব্রত মণ্ডল বুঝতে পারবে—তা দুরাশা। চোখ-ঠারা যায় যেমন বিবেককে বা সৎ প্রত্যয়-জাত ইচ্ছাকে—তেমন স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিপদে আটক পড়লে অমন ভেদরেখা মুছে যায়। ঈশ্বর-স্মরণে কম্পিত-কলেবর বন্যার সময় একই বৃক্ষে সাপ ব্যাঙ ইঁদুর বেজী এবং দ্বন্দ্বা মানুষ, যিনি হয়তো নাস্তিক। গেরস্থর ধেনু কামধেনু হয় কিনা, তা বিচার করে দেখার জন্যে প্রচুর অবকাশ প্রয়োজন। অকালে ফুল ধরলে বৃক্ষের নাম হয় বারোমেসে। গৌড়গ্রামের মানসপটে এমনতর ভাবনার আগ্রাসন। মরীচিকা সাহারার মধ্যে বিভ্রান্ত পথিকের মৃত্যু সন্নিকট করে তোলে যে-মোহ-বিস্তার মারফত, তা আশীর্বাদ বৈকি—যখন দগ্ধানির তুরপুন আর দীর্ঘ বা বেধ-গভীর হয় না।

—মা!
—কী বুলান!
—আমার মাথা ঘুরছে।
—শুয়ে থাক।
—শুয়ে থাকব?
—হ্যাঁ।
—মরার সময় মানুষ শুয়ে থাকে কেন?
—বালাই ষাট, কী অলক্ষুনে কথা।
—না, মা। সত্যি শুয়ে থাকে কেন?
—মরা লোক কি খাড়া থাকতে পারে বাবা।
—তবে আমাকে শুতে বলছ কেন?
—দৌড়াদৌড়ি করলে আরো ক্ষিধে পাবে। তুই আবার দুধ-দুধ চীৎকার করিস।
—পোকগুলো—।
—ছিঃ ছিঃ, পোক বলতে নেই।
—তবে লোক বলব নাকি?
—কে জানে, ওগুলো কী। চুপ থাকাই মঙ্গল।
—জানো মা, পাট-চাষ বন্ধ করার হুকুম।
—কেন?
—পোক বাড়ে।
—আবার পোক?

—থামথা ধমক দিও না। জমিন খেয়ে যাচ্ছে, চাল আর বাইরে থেকে আসবে না। তাই পাট-চাষ বন্ধ। মাদবর বললেন।
—ভাল কথা।
—কিন্তু আমাদের তো পাটের জমিনই বেশি। ধান হয় না।
—সকলের কপালে যা আছে আমাদেরও তা-ই হবে।
—কপাল না হাতি।
—তুই খেলতে যা।
—কেউ খেলতে আসে না।
—তবে শুয়ে থাক।
—তুমি মাঠে গেলে দেখতে কতো ন্যাড়া। আর চাষ করে লাভ কী? কখন খেয়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।
—আমি কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, আমি পোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব। মাদবর-পাড়ায় আমার কাকা আছে গফুর। সে-ও তা-ই বলে।
—পোক—ছিঃ ছিঃ, বলতে নেই।
—আর কোন শব্দ বেরোয় না তোমার মুখ থেকে। খালি ছিঃ আর ছিঃ।
—তোর গফুর কাকা কী বলে?
—সে যা বলে তুমি কানে আঙুল দেবে।
—ছিঃ ছিঃ।
—আমিও তা-ই বলি। পোকের চেয়ে লোকের দাম কম। এ হয় নাকি?
—কী সব যে শিখেছিস—?
—আমি দুধ খেতে চাই, মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে চাই। আমি—।
—খাবে বৈকি বাবা। মসিবত আর কদিন থাকে।
—কদিন কদিন করে ক' সাল কাটিয়ে দিলে।

মা আর জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যখন কাঁদতে লাগল, পুত্র চুপ করে গেলেও তার নাকের ডগা ফুলে-ফুলে উঠছিল। প্রতীয়মান হয়, সেও কাঁদছিল, যদিও নীরবে, এবং তা নিছক কান্না নয়, গুমরে-ওঠার এক নিঃশব্দ পর্যায়।

আট

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, সে-সম্পর্কে গৌড়গ্রামের কেউই তেমন ওয়াকিবহাল না-থাকা বিধায় চাপবাঁধা অসুবিধা তখনও অপ্রকট ছিল। যে-যার গন্ডীর মধ্যে ধানাইপানাই করছে তো করছেই এবং তেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় হন্যে দৌড় মারছিল না। অর্থাৎ অসুবিধা একসারিতে তখনও তেমন দাঁড়ায়নি যে একটা সেনাবাহিনীর মতো কুচকাওয়াজ-কালে জানান দিয়ে যাবে : এই আমরা চলছি সঙ্গীন, কিরীচ হাতে, যদি বাধা দাও, মঙ্গল নেই তোমাদের। বহু দীর্ঘশ্বাস একত্রে মিললে তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয় না শুধু, তার একটা এমন গুণগত পরিবর্তন ঘটে যে কেউ আঁচও করতে পারে না, এই বায়ুর উৎসভূমি কোন বক্ষ-পঞ্জর। ধাপে ধাপে এগোনোর রেওয়াজ প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে বলে বোধ হয়, এখানে সবকিছু বেশ বিলম্বে ঘটছিল। এমন-কি যে-পঙ্গপাল রাতারাতি গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে চলে যায়, তা এই ক্ষেত্রে ঘটতে দিচ্ছিল না। একথা

খুব সহজে বোঝা যায়, যদি লোকগুলোর দিকে তাকাও। অসোয়াস্তি আছে, কিন্তু মনের সেই অবস্থা নেই, যা দিয়ে মানুষ এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে গমনের বাসনা পোষণ করে। অথবা এমনও হতে পারে, পঙ্গপালগুলো বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, বেশি চোটপাট চালালে প্রতিপক্ষ মরীয়া হয়ে ওঠে—যা আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং অন্যদিকে রসদ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা। তার চেয়ে ধীরে ধীরে বহুদিনের নিরাপত্তা বজায়ের জন্যে বরং কিছু শ্লথগতি হওয়া উচিত। এসব নিতান্ত অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত হওয়ার দরুন সোজাসুজি স্পষ্ট কিছু বলার দাবি নিতান্তই বুদ্ধি-অগ্রাহ্য। তবে লক্ষণ দেখে কবিরাজ যেমন চিকিৎসা চালায় রোগ সঠিক ধরতে না পেরেও, এখানে তেমন পন্থা বুঝবার জন্যে কিছু মদত দিতে সক্ষম। এসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু এই যে কোটি কোটি প্রাণী যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে সোজা রেখায় মাত্র দু-একটির হাড়হদ্দ দেখে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তো নয়ই বরং চেষ্টা পাওয়া উচিত যেন খণ্ড খণ্ড হলেও আসল হদিসের রূপ যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকুই মঙ্গল। একদম সর্ববিশারদদের পাঁজি খুলতে গেলে, হয় নিষ্ক্রিয় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অথবা অন্ধের মতো হস্তী দেখেই গাঁয়ে গল্প ফাঁদার জন্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

গফুরের বউ সখিনা নসীবের কথা হামেহাল উত্থাপন করে বলে এবারও সে ধরে নিয়েছিল, দুনিয়ার তাবৎ মসিবতের সে-ই হচ্ছে প্রথম শিকার। বাড়ির সীমানায় মাচাঙের উপর কিছু শিমের লতা তুলেছিল সখিনা একটা মানত মেনে। যদি গাছে ভাল ফল ধরে সে মসজিদে দুথালা মিষ্টি ক্ষীর দেবে এবং ইমামের জন্যে আধ সের মোটা-মোটা অথচ কচি-দানা শিম সওগাত-স্বরূপ পাঠাবে। গোটা মাচা ভরে লতা উঠেছিল যদৃচ্ছা এদিক-ওদিক প্যাঁচের নানা কসরতসহ, গৃহকর্ত্রীর সাজিয়ে-সাজিয়ে দেওয়া কঞ্চি বা বাখারির উপর নির্ভর, যেন প্রেমিকের ইচ্ছার শত পাক। সখিনার মন সায় দিত না যে এইসব অবলা লতাগুলোর উপর কোনদিকে এতটুকু চোট আসবে যা তাদের নরম-নরম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যথা দেবে বা বর্ধনের ক্ষতি করবে। কিন্তু সে নিজেই এই প্রত্যাশা নিরুপায় ভঙ্গ করত, এক-চিল্‌তে ভিটের মালিক তো তারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—যেখানে রোদ্দুর লাগে এমন জায়গার শত টানাটানি, একটা ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে। রীতিমত মনের সঙ্গে লড়াই চালাতে হত সখিনাকে, যখনই এমন-ধারা কাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁয়তারা কষত। কিন্তু উপায়হীনতার চোটে যখন সব যুক্তির হাড়গোড় চুরমার তখন খুব জোর একটু কালক্ষেপ করা চলে, অবশ্যম্ভাবিতার চাকার তলায় না শুয়ে চারা থাকে না। সখিনা তার রাত-বাসি ভিজে কাপড় মাচাঙের উপর মেলে দিতে গিয়ে ভেবেছিল, একটা পর্দা অন্তত টানানো হল যা তার প্রিয় শিম-লতার ডগাগুলোকে বদ্‌নজর এবং পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করবে না শুধু, চড়া রোদ্দুর থেকেও রেহাই দেবে। কিন্তু রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ব্যস্ততার দরুন উঠানের দিকে নজর দিতে সে ভুলে যায়নি কেবল, বরং বেমালুম মানত—তার কাপড় যেন ঘরে সিন্দুকে রাখা আছে এবং সে প্রচ্ছন্ন আনন্দের এমন রেশ আবার ভোগ করবে, যেহেতু কাপড় ধোওয়ার কাজটা তো অনুপস্থিত। গৃহপালিত গোরু ছাগল হাঁস মুরগী এবং তাবৎ গেরস্থালির খবরদারি সখিনা সেদিন নতুন করছিল না যে আলস্য-জাত খোঁয়ারির উপর সে দিন-গুজরানের ভিত্তি পুঁতবে এবং পায়ে-পা-দিয়ে-বসে থাকার প্রত্যাশায় গাফিলতি চালাবে। কিন্তু মাচাঙের দিকে তার চোখ কেন যে সারা দুপুর, সারা বিকেলও গেল না, তার হদিস-খোঁজে সে বিফল হয়েছে পরে। অথচ সেদিকে দৃষ্টি যেতেই তার বুক থরথরিয়ে উঠছিল এত দ্রুত, যখন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। তারপর ঈষৎ আত্মস্থ চোখ কচ্‌লেছিল সে একবার, দুবার নয়, বহু শতবার, না আরো অনেক গুণ, কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একান্তে অবস্থিত এক চিল্‌তে সবুজ দেখার জন্যে—যার

আয়তন-মোহ কবির নিকট শস্যশ্যামল জন্মভূমি-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল একদা। মাচাঙ-উজাড় শূন্যতায় নিজেকে সখিনা সোপর্দ করে এক নিঃশ্বাস ছাড়া অবয়বের অন্যান্য চাঞ্চল্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গড়খাই কেটেছিল যেন অশ্রুসহ সকল বেদনা নিঃসাড় পাথরে পরিণত হয়। লতার জায়গায় খণ্ড খণ্ড ন্যাকড়া ঝুলছিল—আততায়ীদের নিশান যার মধ্যে ঘোষণা করে গেছে সর্বগ্রাসী সতর্কবাণী : কেবল সবুজের সীমানাই আমাদের সীমানা নয়। মাচাঙের বাঁশ, কঞ্চি, বাবলা বা অন্য গাছের সরু ডালপালা হঠাৎ গতিবন্ত সঙ্গীন বা কোঁচের মতো সখিনাকে খুঁচতে লাগল আষ্টেপৃষ্ঠে মুরগী-রোস্ট করার প্রক্রিয়ায় যেমন প্রয়োজন। শাড়িটার ঐতিহাসিক আবেদন ছিল। পিতৃস্মৃতির স্পর্শ সুতার পাকে পাকে সখিনা বহুদিন করত এবং আনন্দ-ডগমগ এই বসন সে লেপ্টে নিত সারা শরীরে। বস্তুধ্বংস শুধু কেবল অনড় পদার্থের বিলয় নয়, বরং মনুষ্যধ্বংসের মতোই তার তলায়-তলায় বইতে থাকে নানা জীবন্ত প্রবাহ, যদিও বাইরে ধকধকানি এতটুকু কারো চোখে পড়ার কথা নয়। গফুরের বউ তখন নিজেই পদার্থে পরিণত হয়েছিল এমনই পাষাণ-পর্যায় যে সারা সাঁঝ সে গেরস্থালির সব শৃঙ্খলাপনা ধান-সারা-কালীন কুলোর বাতাসে তুষের মতো উড়িয়ে দিলে, তাকিয়েও দেখলে না কোন দিকে কী ধাইল। গফুর নিজের কাজ ছাড়াও সেই সময় উদ্বিগ্ন, নানা আশঙ্কার তাগিদে এপাড়া-সেপাড়া ছুটে বেড়াত নিজের চালচুলো রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যেন ভূতে পেয়েছে এমনই। জমিনের ধারে, যা সামান্যই আছে, আর সে যেতে পারে না। তা নিয়ে মনের সঞ্চিত ক্ষোভ সে চেপে রেখেছিল এই ভেবে যে সে তো আসলে গাড়োয়ান, সুতরাং একদিকে না একদিকে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামের সীমানা বন্ধ হওয়ার ফলে, রোজগার চুলোয় যাক, আরো সমস্যা দেখা দিয়েছিল যেখানে তার একার চিন্তা আর পাহাড়-প্রমাণ নয়। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি-ফেরার সময় মুর্গীছানা-গুলোর চ্যাকচ্যাকানি শুনে মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, হঠাৎই বলতে হয়। গফুর সম্পর্কে গ্রামে কেউ অযথা দোষারোপ করার লোক আছে, এমন সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সখিনা তখনও বাঁশ-সংলগ্ন আর এক থাম বা ঘাস বিশেষ যেন নতুন ঠেস দরকার মাচাঙের ফল-ভার বেশি বিধায়।

—খাড়ায়া কী করেন, লবাবজাদী?

নবাবপুত্রী বংশদণ্ডের মধ্যে তখন গভীর অনুপ্রবিষ্ট, অন্তত তা-ই ধারণা করা উচিত, যখন কোন জবাব বা প্রতিক্রিয়া এল না অন্য পক্ষ থেকে।

—করতাছ কী?

—!!!

—করতাছ কী?

—মুখে ফুটো নাই, রাও নাই?

—!!!

—দু' ঘা দেওন পড়িবো?

তখন সখিনা এমন স-চিৎকার কান্না জুড়েছিল যে গফুরের মতো হুঁশিয়ার যুবকের পর্যন্ত ধারণা, পাগ্‌লোমির প্রাথমিক স্তরের এই বুঝি প্রারম্ভ। সে আর মেজাজ চড়ায়নি বা মেজাজে জল ঢালতেও এগোয়নি। তবে সত্বর সে বুঝে নিয়েছিল, একটা ভীষণ কিছু ঘটে গেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, যার লক্ষণ-রূপে ওই চিক্কর-কান্না তখনও কানের পর্দায় মোতায়েন।

—কী অইল, কইবা না?

—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু না তো কাঁদোসেন।

—লবাবজাদীও কাইন্দে।

—গোস্বার কথা না, অইল কী?

সখিনা তখন একবার মাচাঙের দিকে আঙুল বাড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যাপ্রহরের অন্ধকার তো চোখ সম্পর্কে এমনই উদাসীন যে দৃশ্যপট সাজিয়ে রাখার কথা ভাবেনি। সুতরাং গফুর কিছুই দেখলে না, কিছুই বুঝলে না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব-কৃত জালে জড়িয়ে পড়ছিল, যখন অপর পক্ষ, আর তার উদ্ধারে আসবে না, সে জানত।

—কী হৈল কও।

—আমার কান নাই, তোমার চক্ষু নাই।

সখিনার তীক্ষ্ণস্বর অন্ধকার কমতে তো দিলেই না, বরং দুজনের মধ্যেকার ফাঁকের আরো বিস্তার ঘটল।

সেদিন ডিপা জ্বালিয়ে আনার সময় গফুরের মনে হয়নি কেন, সেই জানে এবং জানা উচিত ছিল এমন ক্ষেত্রে যখন কান সজাগ থাকলেও কান নিষ্কর্মা।

—গোস্বা করছ?

—না।

—তবে কী অইছে কও না ক্যান?

—লবাবজাদার মেজাজ আমি ক্যামনে সামাল দিতাম।

—হে তো গত বছরের কথা।

—না, অহনের।

—আরে যাইতা দাও।

—হব গ্যাছেগ্যা।

—হব?

—যায় নাই, যাইবো।

—কী যাইব?

—আমি যামু।

—কুথা?

—কবরে।

—কী আর কইছি, অ্যাতো গোস্বা?

—একডু না।

সখিনা বিনা-বাক্যব্যয়ে লক্ষ্মী রমণীর মতো কয়েকটা মুর্গীছানা আঁচলে তুলে অনু-পদী ধাড়ীটাকে আয়-আয়-শব্দে আশ্বাস দিয়েছিল, যখন গফুর আসন্ন বিপদের মুখ থেকে পরিত্রাণের আশায় মুখ খুলেছিল,—যাও কুথা, কইয়া যাও।

—আহি।

সখিনা এবার একা না এসে সঙ্গে বয়ে এনেছিল এতদিন উঠান উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে যার সাহায্য নিয়েছে প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে। প্রদীপ নয় ডিপা। হাতে প্রদীপ কালিদাসের ইন্দুমতীর মতো সখিনা এগিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে মাচাঙ-অভিমুখে, চোখে অঝোর জল এবং এক রকমের চাউনি —যার ব্যাখ্যা দুই চোখ দিতে অসমর্থ।

গফুর চিৎকার দিয়ে উঠেছিল—অ্যাঁ—কাবড়ও খাইছে?

সখিনা মাথা নাড়লে না জবাব দিতে, বরং আরো অনড় হতে লাগল দীর্ঘশ্বাসে শরীরের স্ফীতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে। গফুর এই ক্ষেত্রে কী করবে, তার স্থির-নির্দেশ পেতে এদিক-ওদিক

ভাবলে : বাতাস নিরেট থেকে পাতলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাসি ছিটিয়ে সে উচ্চারণ করেছিল, যখন অপর পক্ষ কতকটা শান্ত অথবা চুপ হওয়ার পথে দ্বিধান্বিত,—হ হালা পোক্ বসন ধইরা টানতাছে। পোক রসিক আছে।

সখিনা কোন কথা না-শোনার ভান করে নিজের মনেই স্পষ্টত চিৎকার দিয়ে উঠে,—মশ্‌করা থুইয়া রাখো।

কিন্তু গফুর তো বৌর সঙ্গে পয়লা দিন ঘর করছে না যে আসল হদিস পেতে অশেষ আয়াস প্রয়োজন। পাঁয়তারা সফল দেখে সে নিজের চরকায় আরো তৈল-সংযোগের পর জোরে জোরে সহাস্য উচ্চারণ করেছিল,—হালা কেষ্ট ঠাকুর সাজছে। এইবার দ্যাখব হালারে।

কান্নার বেগ দ্বিতীয় দফা চেপে এলেও সেদিন পত্নী আর নিজের সড়কে স্থির থাকতে পারেনি। বরং আরো শান্ত গেরস্থালির কাজে মন সংযোগ করেছিল।

নয়

সমস্যা বুদ্বুদের মতো এক, দুই—তারপর ক্রমশ জনতার আকার, এবং জনতা যেমন হুড়মুড় উত্তাল হতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে, তেমনই তাগদযুক্ত জটিলতায় জুটতে লাগল। তখন তা আর শুধু হাহাশ্বাস বা চক্ষু-বন্ধ মারফত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না এইজন্যে যে, তুমি যেমন ব্যক্তি এবং তোমার অভিঘাত আছে বস্তু-রূপে, তেমন বস্তুরও ব্যক্তিত্ব আছে। বহুকালের ঐতিহ্যে গৌড়গ্রাম বর্ধিষ্ণু-রূপে খ্যাত ছিল বলে প্রথম-প্রথম অভাবজাত চোটপাটে কেউ তেমন গা করেনি অথবা তার আঘাত এমন সুড়সুড়ি-পর্যায়ে ছিল, একটা বিরক্তি জাগাতে পারত মাত্র। অর্থাৎ তুমি মশা-তাড়ানোর কায়দায় কামড়ের জায়গায় হাত বুলাতে, নিজের আসন পরিত্যাগ বা কামান-দাগার আয়োজন করতে না। এবার যো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে এবং জের যখন ছুটল তখন তা বেগবান উন্মত্ত অশ্ব। এক, খাদ্যসমস্যার কথাই ধরা যেতে পারে অপিচ অন্যান্য সমস্যা স্ব-বৈশিষ্ট্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জঠরের স্বাভাবিক চাহিদা যখন দুরূহ হয়, ক্ষুন্নিবৃত্তির নানারকম উপায় কলম্বসেরা আবিষ্কার করে। অবিশ্যি এখানে আবিষ্কার-কর্তার অবয়ব নানা পর্যায়ে বিচরণশীল এবং উপায়ও ঠিক সেই অনুযায়ী আবর্তিত, বিবর্তিত বা অনুবর্তিত হয়। আদিম কাল থেকেই তা ঘটেছে বলে কেউ যেন মনে না করে, তা ঠেকে-শেখা-গোছের কোন অভিজ্ঞতায় মানুষ বিত্তবান। এমন হলে তো গৌড়গ্রামে একদা যা ঘটেছিল তা আর যে কোথাও ঘটত কি, তার সম্ভাবনার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। কানামাছি খেলার মতো শুধু আন্দাজে অনুমানে, তুমি চোর, আর কাউকে স্পর্শ করে তবে খালাস পাবে, তেমন পর্যায়ই গ্রহণীয় এবং চলছিলও তা-ই। গৌড়গ্রামে একে একে যা ঘটতে লাগল, তার পূর্ণ ফিরিস্তি আর কোন দেশে বিধৃত হয়েছে বলে কেউ কোনদিন বলেনি। এক স্বাতন্ত্র্যের মহিমা এই দিক থেকে উক্ত এলাকার কপালে বসে ছিল—রাজাধিরাজ, অথবা সর্প-দংশন করলে যেমন ক্ষত-জায়গায় সাপুড়ে বিষহর পাথর লাগিয়ে দেয়, এ-ও তেমনি। প্রাথমিক লক্ষণগুলো যেভাবে প্রকট হল তা দেখেই পরবর্তী ধাপ অনুমান করা যেত। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, বর্ষাকালে নর্দমায় মাছির ডিমের মতো অসংখ্য। পুণ্যসঞ্চয়ের অন্যতম পথ হচ্ছে করুণা। হ্যাঁ, তোমার বুক কাতরালে বা চোখের কোণ ভিজে উঠলেই তা থেকে রেহাইয়ের পথ বের করতে হয়। ওই রাস্তা তোমার আত্মা-পরিশোধনের উপায়, যেমন বালু-যোগে পানী ফিল্টার। তাই একটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে জীবনে কিছুই হারানো যায় না বা হারা হয় না। পৌষ মাস বা সর্ব-নাশের আকার বিভিন্ন, একথা শুধু নাস্তিকেরা বলতে পারে, যারা সর্বদা পুণ্য-অর্জনে অনাগ্রহী।

কিন্তু যারা ভিক্ষাব্রতের প্রতি দুরন্ত ঘৃণায় চোখ লাল করে, তারা চোর ঠগ দস্যু বাটপাড় পকেটমার বা আর কিছু হয়। এইভাবেই হিসেব নিলে শেষ পর্যন্ত কিসে কিসের আবির্ভাব ঘটে তা ধার্মিকও বলতে পারবেন না। অর্থাৎ প্যাঁচ, প্যাঁচ কষে যাও, ঘটনার পর ঘটনা এলোপাতাড়ি সাজিয়ে দেখবে দুনিয়ার জটিলতা নিয়ে বাড়াবাড়ি নাদানের কর্ম। এই চিন্তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কায়দায় হাজার হাজার হ্যান্ডবিল বা প্রচারক-মারফত বিস্তার করে দিলে তখন খাদ্য বাতাসে পরিণত হয় এবং যদিও সভ্য শহরে বায়ু খরিদ ছাড়া উপায় থাকে না, তবু বলা যায়, বাতাস-ভক্ষণ দ্বারা মানুষ বাঁচে বৈকি। কিন্তু তখন সবকিছু ওই অদৃশ্য অথচ স্পর্শদ রাসায়নিক দ্রব্যের আকারে মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত হয়। জীর্ণ শরীর তারই পরিণতি, যেমন স্বপ্নও তার হাত ধরে আসে, হয়তো সুখদ নাও হতে পারে। আঁতুড়ীর ভেতরে পর্যন্ত বাতাস ঢোকে এবং সবই ক্রমশ অদৃশ্য করে তুলতে চায়। বার্নাড শ' যে মানুষের নিছক চিন্তায় পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সহজ এ-ই এক উপায়। দুর্ভিক্ষ-কালের মড়ার খুলিগুলো শাঁসশূন্য নারিকেল-মালার মতো পথে ঘাটে বা কবরে পড়ে থাকার দরুন কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। একটু মনোযোগসহকারে তাকালে চোখে পড়ত, হাড় পর্যন্ত কুঁচকে গেছে, যেহেতু মজ্জা পূর্বে শুষ্ক। গোড়গ্রামে এসব নিদান কাউকে বাতলাতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তা এসে জোটে এইজন্যে যে এলাকায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শুধু মোহাম্মদ আলী এবং আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই পাঁড় নয় সব তিলে—ঘুঘুর শ্রেণীভেদে যা বলা হয়। বাতাসের চাহিদা সেবার এত বেড়ে গিয়েছিল যে আকাশ যোগান দিতে অসমর্থ—যে স্থল থেকে একদা কতো ছায়ার বর্ষণ না ঘটেছিল। বায়ু এবং ছায়া একত্রিত হলে শরীর নির্বিবাদ জুড়িয়ে যায়, এমন কথা যুগ যুগ চালু আছে। শরীরের মতো সম্পদ শুকাতে থাকলে, ছোট ডোবায় গ্রীষ্মের দিনে অনেক ছেলের দাপাদাপি-স্নানে যে-ঘোলাটে অবস্থা হয় এবং মাছের চোখ কাদানির চোটে খাপসি খায়, এ তেমনই ব্যাপার ঘটছিল গোড়গ্রামে। মনুষ্যে মৎস্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু শতাব্দী পরে, সেই আদিম সৃষ্টির কালে যার সূত্রপাত। অথবা বলা যায়, ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে গড়াতে লাগল, গলিপথে অপ্রশস্ততার জন্যে মোটর-ড্রাইভারকে যে-পন্থা অবলম্বন করতে হয় কোন-কোন সময়।

মোহাম্মদ আলী যখন সত্যি হৃদয়ঙ্গম করে যে, তার পক্ষে এই স্থান-পরিত্যাগ সম্ভব নয়, যদিও কাব্যসাধনার পাদপীঠ-রূপে সে এমনই জায়গার খোয়াব দেখেছিল, তখন সে মনে মনে প্রথম খুব বিচলিত হয়নি বটে, কিন্তু ইদানীং সে আস্থা হারাতে বসেছিল। বাইরে অবিশ্যি তেমন প্রকাশ নেই, যদ্যপি লোকজন তার কাছে আসে এবং উপদেশ প্রার্থনা করে। তাছাড়া কোনক্রমে তার রসদের অভাব ঘটবে, এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং থাকলেও হয়তো দূর ভবিষ্যতে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে মোহাম্মদ আলী শিখেছিল, বাতাস কবিতার বিচরণভূমি হলেও মানুষগুলো বায়ুসেবী নয়। সে আরো আঁচ পেয়েছিল, লোকগুলো তার নিকটে সমাসীন হলেও আর পূর্বের মতো সমীহা-জাত ব্যবধান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ। তার করস্থিত হুঁকা থেকে কল্কে তুলে নিতে ক' মাস পূর্বেও দশ দফা ইতস্তত করত বা হাত বাড়িয়ে মুখের দিকে তাকাত অনুমতির জন্যে। এসব ব্যাঘাত, তদুপরি নিজের মণ্ডল-থেকে-নির্বাসিত এবং আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহতা মোহাম্মদ আলীকে এমন ভাবিয়ে তুলছিল যে সে কবিতা মনে মনে আউড়াত আর খাতায় তুলত না। এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তার হাতে বন্দী সে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল বাইরে বলিষ্ঠতার খোলস চাপিয়ে এবং হেন কর্মে তার মেজাজ হচ্ছিল ক্রমশ হন্যে—গোঁড়া ব্যক্তি নিজের আদর্শের স্ববিরোধী ঘটনা দেখলে যেমন হয়। গফুরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলে মোহাম্মদ আলী পরিত্রাণের একটা আশ্বাস খুঁজে পেত এবং অনুষঙ্গের (সে তাকে একদিন গ্রাম থেকে বাইরে পৌঁছে দেবে বলে কতো আশা-পোষণ) তাগিদে ডাক দিত—

বড় সস্নেহ সম্বোধন। কিন্তু যদিও পাশ কাটিয়ে যেতে অক্ষম, তবু অভিবাদন দ্রুত সেরে পলায়নের মধ্যেই গাড়োয়ান গফুরের পরিত্রাণ।

—কেমন আছো মিয়া?

—আল্লার যা মর্জি।

—গফুর, তুমি বড় ভাল ছেলে।

—হুজুর, আমাদের তো মরার দশা।

—না—না। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।

—আপনি কইলে তা পারি। কিন্তু—।

—কোন কিন্তু নেই। ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সেই আশায় আছি।

—তুমি ইমানদার মানুষ।

সেদিন মোহাম্মদ আলী গফুরকে যে জোঁকের মতো লেপ্টে ধরেছিল, তা কেবল ভেতরের ভার নামাতে ছাড়া আর কী। কিন্তু গাড়োয়ানের তখন মনে পড়ছিল, আশায় মরে চাষা, প্রবাদটি— যা দাদু সুরত মণ্ডল প্রায়ই উচ্চারণ করেন। গফুরের আর-একটা বড় সাধ জেগেছিল, কেন সে নিজেও জানে না যদিও। দুই কবির সাক্ষাৎ। কিন্তু তখন যে-সমস্যা গফুরকে ঘিরে থাকত, বোধ হয় ত্রাণের সেই খোঁচানি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, গ্রাম আর শহরের দুই কবি মিলে যদি উদ্ধারের একটা পথ বাতলাতে পারে। কিন্তু সুরত মণ্ডল আর চোখে দেখেন না বিধায় তার পক্ষে কোথাও যাতায়াত— বয়সও আশির কাছাকাছি, অতি দুর্বল—অসম্ভব। মজকুর ক্ষেত্রে মান-অপমানের প্রশ্ন আছে, ছোট-বড়র প্রশ্ন আছে, রুচিভেদের কথা আছে—এমন কতো না বাগড়া। গফুর তাই মুখ ফুটে বলতে গিয়ে থেমেছিল এইজন্যে যে শেষ পর্যন্ত দাদুর না কোন মানহানি ঘটে যায়। তা ছাড়া, কবিয়াল সুরত মণ্ডলের এত প্রশংসা মোহাম্মদ আলী শুনেছিল লোকমুখে, কৌতূহল থাকলে তো নিজেই হাজিরা দিতে পারত। গ্রামের প্রতি মোহাম্মদ আলীর প্রেম এমন স্পষ্ট যে শহর ছেড়ে, নানা আরাম-আয়েস মুলতুবী রেখে নচেৎ কেন সে এখানে পড়ে মরতে এসেছিল গফুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এসব বাদ-বিচার করছিল, তখন রাস্তায় একদল ভিক্ষুক এসে পড়ে। সাত-আটজন, বোধ হয় গোটা পরিবার। মোহাম্মদ আলীর কাছে হাত পাতলে সে কী করত। (যদি দেয় কিছু, শত শত ভিক্ষুককে ওর পেছনে লেলিয়ে দেব রোজ—পাঁয়তারা কষছিল গফুর) খোদাকে মালুম। ভিক্ষুকদের গন্তব্য সম্ভবত আর কোথাও। তাই কবির দিকে চাইলে মাত্র, মুখ খুললে না কেউ।

—মানুষগুলো লাল হয়ে গেছে, গফুর।

—জী।

—আমি লাশের উপর একটা কবিতা লিখব।

—তাহলে লাশ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

—তা হবে বৈকি। সচেতন মানুষ।

—লাশ কে বানায়, কবি সাহেব?

—আল্লা, তার যা মর্জি।

—আমার হাতে কাজ আছে।

—এখনই যাবে?

—হ্যাঁ।

মাদবরের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী কবির কথোপকথনের প্রাচীন প্রসঙ্গ গফুরের সেদিন মনে

হয়েছিল না শুধু, একটা ক্ষুব্ধ চাপা আক্রোশ পেয়ে বসেছিল পর্যন্ত। ভিক্ষুকের কাতার ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছিল মাঠের বিস্তারের সঙ্গে, তার চোখে পড়তে দেরি হয়নি। তখনই আশঙ্কিত গফুর আরো আতঙ্কিত এই ভেবে যে ওরা বোধ হয় গ্রামত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। যাযাবর জীব একদা-মানুষ খাদ্যান্বেষণে বনজঙ্গল-গিরিদরী পার হয়ে কতো ক্রোশ-ক্রোশ পথ পায়ে রগড়ে যেত, যেন সকল অদৃশ্য আহ্বান তাদের জঠরের মধ্যে অর্থাৎ দেহে সীমাবদ্ধ এবং সেই আকর্ষণ তাদের দিগ্‌বিদিক উগরে দিত। গফুর দাদু সুব্রত মণ্ডলের কথাগুলো একবার চানকে নিতে গিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল বুকের তোলপাড়-সহ : ওরা বোধ হয়, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস করেনি অথবা খোঁজ রাখেনি। পোকা, পোকা, পোক্, পোকা। হাজার লক্ষ কোটি অর্বুদ। সুড়ো (যেন মানুষের নুলো) বাড়িয়ে-বাড়িয়ে উড়বে, ছোঁ-মারা কায়দায় নামবে, বসবে, কুচকাওয়াজ করবে। তখনই আর নিঃশ্বাস ফেলতে অসমর্থ, তুমি নির্ঘাত মরবে। বাতাস খেয়ে বাঁচতে, এখন সেই বাতাসেরও অনটন ঘটবেই এবং তুমি আর কিছুই দেখবে না চোখে, শুধু হাঁসফাঁস করবে বুকের ভেতর পাঁজরের আছড়ানি নিয়ে। হে প্রভু, হে এলাহি মাবুদ, ও ঈশ্বর—উচ্চারণ করতে না পারার সহজ হেতু, বাতাসই আর নেই, যা দিয়ে শব্দের ঘর তৈরি হয়। গফুর সেদিন দ্রুত হাঁটছিল বাড়ির দিকে এবং পিছু ফিরে বার বার তাকাচ্ছিল এক তপ্ত অনুতাপে। কবির জন্য সে মুখ তুলে সকল মুখ দেখতে পায়নি—কে গেল, কারা গেল? ওরা তখনও হাঁটছিল দিগন্তের কিনারায় ছায়ামূর্তি—গোধূলি-বেলায় দূর থেকে চাষীদের কুঁড়ে বা বৃক্ষ যে-দশা হয়। পেছন থেকে গফুরের টান-টান মূর্তি শবরীর প্রতীক্ষার সঙ্গে তখন তুলনা অনর্থক। যেহেতু সে জানে না, কোন অভীপ্সায় কোন অভীষ্টের জন্য তার ওই আন্তরিক আথালি-পাথালি। উদ্বাস্তু এবং ভিক্ষুককে এক তৌলদণ্ডে ওজনের নানা অসুবিধার নিমিত্ত এমনই যে যুগলের স্থান-বিনিময় এখন পলকে-পলকে ঘটে, তখন বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। গফুর চেয়েছিল, একবার সে দৌড়ে যাবেই যদ্দুর পারে হাঁক দিতে দিতে —কে তোমরা, কোথা যাও, একটু দাঁড়াও। আমার পড়শী হও বা না হও, কিছু আসে যায় না। আমরা যে একই এলাকার রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত তরু, ছোট-বড় বা বিভিন্ন জাতের—কিন্তু একই মৃত্তিকাসংলগ্ন ছিলাম এই দুর্বিপাকের পূর্ব পর্যন্ত। যেও না, যেও না। এসো, ফিরে এসো। অন্ধকারের গড়খাই তোমাদের সম্মুখে, জানা নেই তোমাদের। এসো, একসঙ্গে সকল দুঃখের বোঝার শরিক হই কাঁধে-কাঁধ। সেদিন মোহাম্মদ আলীকে অভিসম্পাত-রত গফুর গ্রাম-পথে জোরে জোরে পা ফেলছিল, যদিও দিগন্তের দৃশ্য তাকে বার বার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আরও উন্নাসের কাহিনী হাতেম বাদশার সেই আজগবি পাহাড়ের ডাকের মতো। প্রচণ্ড মনের ভার মোছার অনর্থক চেষ্টার মধ্যে সে সুব্রত মণ্ডলের কাছে এসে কেঁদে ফেলেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বৃদ্ধের প্রশ্নে নিরুত্তর এবং সেই দ্বন্দের অবস্থায় দাদুকে ছেড়ে আবার মাঠের দিকে ছুট মেরেছিল উন্মাদের মতো বিড়বিড় আত্মসম্বোধনে, —তোমাদের মুখ দেখতে পেলাম না। চেনার প্রয়োজন কী? এই গাঁয়ের মানুষ এবং তোমরা মানুষ—আমার ভাল-মত জানা মৃত্যুসড়ক ধরে দল বেঁধে চলে গেলে, আমি রুখতে পারলাম না। আমি কিছু বলতে পারলাম না, আরো আফশোস। পেশায় গাড়োয়ান আমার পিতা এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন নানা দিকে নানা যোগ—পুত্র-রূপে আমি তার পেশা তুলে নিয়েছি বলে আমারও যোগ দূর-দূর অবধি। আমার সতর্কতা পর্যন্ত মনে রাখলে না। এই সেদিন মাত্র আমি ফিরে এসেছি ঘুন্ট নিঃশ্বাস কোনরকমে বাঁচিয়ে যেন একদম চেষ্টে না যাও চিরদিনের মতো.....।

অতঃপর শবরী একদিন অহল্যার মতো পাষাণ হয়ে গেল যখন আকুলতা শিল্পীর আদর্শ-স্বরূপ ভাস্কর্যের অঙ্গ লেপ্টে রইল, কিন্তু হৃৎপিণ্ড-ধুকধুক মানুষটা রইল না।

সুব্রত মণ্ডল সেদিন তার চতুর্দিকে হাতড়াতে লেগেছিল গফুরের খোঁজে, যে একটু আগে

আবার রাস্তায় নেমেছিল নিরুদ্দেশ দৌড় দিতে, ফুঁপানির জের বার বার পশ্চাতে রেখে।

দশ

এক অভাবনীয় কাণ্ড দেখা দিতে লাগল। আরো কিছু দিন, কয়েক হপ্তার মধ্যে, যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল বা প্রস্তুত ছিল না—এমন ধারণা খামখা না। রাস্তার পাশে যেখানে ঝোপঝাপ বা গাছ-পালার বেড় অর্থাৎ যেখানে ওত পাতা যায়, এমন জায়গায় দু-চারটে পতঙ্গপাল মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম এবং গ্রামের বেশ কিছু বর্ষীয়ান আগে থেকেই বলে দিয়েছিল : কী থেকে কী হয় বা হবে, তা তো কারো জানা নেই। সুতরাং খামখা ওই পতঙ্গের গায়ে হাত দিয়ে কেউ কিছু যেন না করে বসে—হিতে বিপরীত হবে। তা ছাড়া, এইসব পতঙ্গ যে কোন মানুষের ছদ্মবেশ নয়, যার কাহিনী শাস্ত্রে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে, তা নিশ্চয় করে বলা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এমনও হতে পারে, যেমন এক-কালের আকাশের ছায়া আবহাওয়ার তপ্ত কড়া থেকে সকলকে রক্ষা করেছিল, আবার তেমনই কিছু আসছে যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ সকলের ভবিষ্যৎ জেল্লাদার রোশনাইয়ে পূর্ণিত হবে। সুতরাং, ভাবিয়া-করিও-কাজ, করিয়া-ভাবিও-না গোছের প্রবাদ ভেবেই হাত দেওয়া উচিত যেন আখেরে কাউকে পস্তাতে না হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত, যদি না মরা পতঙ্গের লাশ প্রায় তৎপরতা-যোগ্য জায়গার আশেপাশে ক্রমশ চোখে পড়ত। এবং সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল, তা প্রমাণের জন্যে একবার অকুস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেই যথেষ্ট, গণনার প্রয়োজন ছিল না। গাদা দেখলেই বোঝা যেত। এক দুই গনা যায়, যদিও বস্তু শত হাজারের মোকাবিলা। সুতরাং ঘনত্ব দেখেই আন্দাজ করে নিতে হত, আর সকলে তা-ই করছিল। অন্যদিকে, পতঙ্গ গোনার মধ্যে এমন কী মহৎ ব্রত লুক্কায়িত যে কেউ ফজুল সময় নষ্ট করবে। কিন্তু সকলে একমতের পোষক না হওয়ার ফলে, কারো কারো ধারণা দেখা দিলে : ছদ্মবেশী এইসব পতঙ্গদের কবর অথবা দাহ ক্রিয়াচারে সম্পন্ন করা আশু বাঞ্ছনীয়। গ্রামের এক চিকিৎসক এমন মতবাদের পোছনে আরো ইন্ধন যোগালেন এই ব্যাখ্যা মারফত : পতঙ্গের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না, বরং আততায়ীর দুষ্কৃতির ফলে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রমাণস্বরূপ তিনি বললেন, শরীর থেঁতলে বা চেপ্টে রয়েছে বিধায় স্পষ্ট প্রতীয়মান আভ্যন্তরিক অঙ্গ-বৈকল্যের হেন দশা হওয়ার কোন হেতু অসম্ভব তো বটেই, অন্য বিকল্পও অচিন্তনীয়। অতএব, ময়না-তদন্ত দ্বারা সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ডাণকারী এইসব পবিত্রতা-সিক্ত পতঙ্গদের কোন আততায়ী গোঁড়গ্রামে দেখা দিয়েছে, যারা ওই পাপকর্মে লিপ্ত। নিজ-নিজ সমস্যায় বুঁদ নিষ্ক্রিয় অনেকেই এতদিন ভেবেছে, কেঁদেছে নীরবে অথবা হতাশ্বাস ফেলেছে কি ঐ-জাতীয় একটা কিছুর ভেতর সেঁধিয়ে ছিল। তারা এবার কোমর বেঁধে হাতে ডান্ডা বা ঝান্ডা নিলে, এমনভাবে তৈরি হল যেন দুরাচারদের মোকাবিলা না করা পর্যন্ত জীবন বৃথা। রাতে পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছিল, যখন নিঃশব্দে পতঙ্গেরা স্ব-স্ব-রসদ সন্ধানে ব্যস্ত থাকত বা স্থানান্তরে যেত। তখন অবিশ্যি অন্ধকারে আতঙ্ক দেখা দিল যে পতঙ্গ-রক্ষার জন্যে তাদের এই ব্যবস্থায় আলোর প্রশ্ন অর্থহীন। যেহেতু আলো এবং দিন সমার্থবাচক আর দিনে হত্যা অনুষ্ঠিত হয় না, তখন আলো দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঘুটঘুটে তমসা যেমন চোরের হেফাজত করে, তেমনই সাপের চলাফেরায় সুবিধা যোগায়—যা আর এক অপ-মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া ছাড়া কী? তবু চৌকিদারি কেবল শুরু হল না, অনেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে পতঙ্গ-রক্ষায় এমন মনোযোগী হল তা অন্যান্য সমস্যা খেদিয়ে দিলে। দৈনন্দিনতার খোঁচানি থেকে রেহাই পাওয়ার বহু উপায় আছে বটে, কিন্তু যদি বেশ উত্তাপ ছড়িয়ে হুজুগ-রচনার মতো আর

কোনটাই তেমন কার্যকরী নয়। রীতিমতো নিয়ম-মাফিক আহারের অভাবে এই গ্রামে সচরাচর ক্লান্তি প্রত্যেকের ছিল এবং যাদের এমন দুর্দশামুক্ত তাদেরও ছোটখাট মশালা-বিহনে চুন-মুখ সদা সাদাই থাকত। কিন্তু দেখা গেল, অমন সমস্যা যেন ঝড়ে উড়ে গেছে, যখন রাত-পাহারার হাঁক বেশ দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে দিতে থাকল—যার অনুস্মৃতি আততায়ীদের সতর্ক করে দিতে নয়, বরং তাদের ঘুম না এসে যায়, তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। খরিদ্দারের মন-যোগানোর উপর উপার্জন নির্ভরশীল। এমন কথা জানা আছে বলেই গ্রামের চিকিৎসক দশজনের গণ্ডায় আণ্ডা দিয়ে বসে ছিল এবং সে কোন উচ্চবাচ্য তোলেনি, যদিও বাইরের এলাকার সপ্তো যোগাযোগ-ছিন্নতার ফলে তার ওষুধের স্টক নিঃশেষ। তার আরো জানা ছিল, তুকতাক ঝাড়ফুঁকে ভেষজ তেমন কিছু প্রয়োজনও করে না। মোহাম্মদ আলী কি কবিতা লিখেছেন, লিখতে না-পারার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পর্যায়ে, তা অপরিজ্ঞাত থাকলেও একটা হদিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে আর তেমন বেরোয় না বা পথের লোক ডেকে-ডেকে আলাপচারিতা মারফত তার সর্বচর মন সচল রাখে না। কিন্তু এই মণ্ডকায় তার সমর্থন কতদূর গড়াতে পারে, যখন দেখা গেল সে নিজে ডাণ্ডা হাতে পাহারাদারদের সপ্তো হাঁটছে নিঃশব্দে চোখ তেড়ে তেড়ে এবং বেপরোয়া-ভাব—সব বিষাদ ঝেড়ে ফেলে তেজী আরবী ঘোড়ার মতো—তখন তা অনুমান করা যায় অতিশয় বিস্ময়ে, যার মাত্রা শুধু কারো মৃত পিতার আকস্মিক উপস্থিতি ম্লান করে দিতে পারে সংখ্যায় এবং গুণে। বস্তুর ব্যাপারে যারা নির্বিকার, অ-বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের আসক্তি বেশি। এই ধারণার বশবর্তী, মোহাম্মদ আলী বস্তুরাজ্যে নিজের দেহ ফেলে রাখে মাত্র—আত্মার দীপঙ্করেরা যা করে এসেছেন যুগে যুগে, মুহূর্তে মুহূর্তে। পূর্বে নিস্তেজ হয়ে যেত গ্রাম সন্ধ্যার পর-পর, খুব জোর প্রহর-রাত্রি সজাগ। কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলায়, চলাফেরার শব্দে যেমন সরীসৃপ-কুল পাখপাখালিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তেমনই তখন মনুষ্য-চরণ।

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য ব্যাপার—পতঙ্গের লাশ অল্পবিস্তর সড়কে, গুণ্ড জায়গায় বন-বাদাড়ের পাশে দেখা গেলেও, আততায়ী টিকি রাখলেও হয়তো দেখা যেত না। কারণ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হয়রানির সমুদ্রে এক রকমের ঝড় হামেহাল ওঠে এবং এও ঘটে যে তার বিশদ বয়ান নেপথ্যে থাক। তখন নিজেদের মধ্যে সন্দেহের ভূত সওয়ার হয় রণ্‌পা নিয়ে, দ্রুত হেঁটে যায় এক ঘাড় থেকে অন্য ঘাড়ে যেন সকলে পিছনে ফিরে তাকায়, কে চরণ রাখল দেখার জন্যে, যদিও কিছুই চোখে পড়বে না ভূতের অদৃশ্যতার জন্যে। তখন পেছনের লোকের উপর সন্দেহে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, আবার ভূতের পা ঘাড়ে বিধায়, মনে হবে, সামনের লোকও এমন ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া তখন ঘুড়ির সুতোর মতো প্যাঁচ খেতে-খেতে এত জড়িয়ে যায় যে আত্মধিক্কার না হোক, আশেপাশে যাকে পাবে তাকেই গালাগাল দিতে হয় যেমন বড়ো সাহেবের ধমক খেয়ে বাবুর্চি মুর্গীর ডানা ধরে আছাড় মারে—আর কিছু নাই পারুক।

অভিযানে অনেক দলে যোগ দিলেও সামন্তপাড়া এবং মিয়াপাড়া, দুই পাড়া গোদার মর্যাদা মাথায় বাঁশতলা সারগাদা ইত্যাদি চষে ফেলছিল, যখন লাঙলের কর্ম অনেক কমে গিয়েছিল ফসলের অনিশ্চয়তাহেতু। আবার কাইজ্যা বাধল এই দুই পাড়ায় সন্দেহের শিমুল তুলো ফাটিয়ে এবং জোরশোর—যার ফলশ্রুতি, পাহারাদারির কাজ যদিও গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই পর্যায়ও রইল না, বরং শুরু হয়েছিল ভেতরে ভেতরে লাঠালাঠি তাপ কিছুদিন জমবার পর এবং একদলকে আততায়ীর টুপি পরিয়ে মা-চণ্ডীর থানে পাঠাতে লাগল বলির উদ্দেশ্যে। তারপর খাঁড়া দুই হাতে ঝলকে উঠল নৈরাজ্যের মন্ত্র হাঁকড়ে : যাকে পাও কোতল করো।

সেই সময় পতঙ্গের লাশ কিছু হ্রাস পাওয়াহেতু মানুষের মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই বিপরীত অনুপাত একটা নিয়ম রূপে চালিয়ে দিলে কোন অশুদ্ধি ঘটবে বা ঘটতে পারে, তার চিহ্ন

অন্তত গোড়গ্রামে মিলল না। মোহাম্মদ আলীর কবি-চিত্ত মৃত্যুর ফলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল বলে যদি ধারণা করা যায়, তা অমূলক বলার কোন পথ না-থাকার হেতু : তার দলভুক্তির পরিচয় অস্পষ্ট হলেও সে মজায় খেয়েছে-দেয়েছে এবং দল-পরিচালনার কৌশল বাতলে দিয়েছে অনেককে, যারা তার কাছে গেছে উপদেশ-আলোকে মুক্তিস্নান বা যুদ্ধজয়ের উল্লাসের জন্যে। গফুরের উপর, বুলানের উপর এবং জাতীয় কিছু যুবক-কিশোরের উপর নজর পড়েছিল, যারা আততায়ীর ভূমিকা-পালনে শারিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতেনাতে কোন প্রমাণ না-থাকার দরুন তেমন মুখ-ফোটা দোষারোপ কেউ করেনি এবং তা না-করার কারণ, পাহারায় ওদের গাফিলতি ছিল না। তবে ঘুর্ণীস্রোতের অভ্যন্তরে যেমন আরো নানাকায় স্রোত পাক খায় এবং স্ব-স্ব কক্ষপথে আবর্তিত অথবা ধাক্কায় কক্ষচ্যুত হয়, এখানেও তেমন ব্যাপার ঘটতে লাগল, সবই অবিশ্রি গতিসমন্বিত। পূর্বের নিস্তেজ ভাবমুক্ত এই আবহাওয়ায় অবিশ্রি দৈনন্দিনতার অভিঘাত আরো জানান দিতে লাগল, যখন হতাশা পর্যন্ত আরো ঢিমে-তেতালা নয়, বরং তেওড়া কি চৌতালে পর্যবসিত। যার ফলে, যেমন আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তেমনই উল্টো-ফোঁসের বাপ্প—এইমাত্র ঝাঁপি থেকে মুমূর্ষু সাপের মতো হিসহিস শব্দ তুলে অস্থির।

যেহেতু বুড়ো মানুষ পাহারাদারির তাগদ-বঞ্চিত এবং বয়সের জন্যে স্থির শান্ত দৃষ্টি মারফত সবকিছু দেখতে অভ্যস্ত, মাদবর সেই সময় মোহাম্মদ আলীর নিকট গিয়েছিল, যদি কোন পন্থা মেলে যা বিপদের উপর বিপদ ওই আত্মকলহ থামায় বা চোন্দ পুরুষের ভিটে ত্যাগ-রত যে-যেদিকে পারে ছুটছে—তা রোধে সহায়ক হয়।

—আপনার কথা ঠিক মাদবর সাহেব। মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মোহাম্মদ আলী সায় দিয়েছিল গলায় দীর্ঘশ্বাস জমিয়ে।

—আজ্ঞে, আমি কই, ক্যান?

—তার কারণ সোজা। মানুষ সবুর করতে শেখেনি। একটা কথা মন দিয়ে শোনেন। আপনি যখন চিন্তা করেন, আপনাকে চুপচাপ থাকতে হয়। তাড়াহুড়া চলে না।

—আজ্ঞে, তা-ই।

—সব কাজের এই ধারা হওয়া উচিত।

—জী।

মোহাম্মদ আলী ইতিহাস থেকে নজীর দানের ইচ্ছার ইতস্ততায় দোল খেতে গিয়ে সামলে নিয়েছিল এই উক্তি স্বারা,—কিন্তু ধৈর্য যদি ধাতে না থাকে?

জীবনে এই প্রথম মাদবর সাহস-সঞ্চয় মারফত একজন জ্ঞানী মানুষের উপর কিছু চাপ এবং ঝাঁকি দিতে বেশি বিলম্ব করেনি।

—কিন্তু কবি-মহাশয়, পোলাবান ধুকে ধুকে মইরব। হে কী বাপ বইস্যা দেখতে পারে?

—সমস্যার চোখে আপনি আঙুল দিয়েছেন, কবির জবাব যেন শানানো ছিল, ঝিলিকসহ বেরিয়ে পড়ল।

মাদবর বিস্ময়ে কবির মুখের দিকে তাকালেও চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল উচ্চারণ নিক্ষেপ-কালে,—কিন্তু মানুষ কী শত শত বছর সবুর করতে পারে?

—পারা উচিত।

—কঠিন কাম। সাধারণ মানুষের কাম না।

—পারা উচিত। নিজের ভিত্তিভূমিতে আরো শিকড় পুঁতে কবি যোগ করেছিল,—উচিত আলবত। চোন্দ শ' বছর সবুর দরকার হলে করতে হবে।

—কিন্তু মানুষে বাঁচে কদিন?

—ষাট-সত্তর-আশি-নব্বুই।

—হুজুর, হে আর কয় জনা। গত দু মাসে আমাগো গাঁয় কম-সে-কম দুশে পোলাবান মরছে। বয়স এক মাস থেইক্যা সাত-আট বছর।

মাদবর কীভাবে অকস্মাৎ বুকের পাটা তৈরি করে ফেলেছিল, সে না জানলেও জবাব দিতে দেরি হয়নি।

—সকলে মরেছে।

—হ। কিন্তু ক্যান মরছে?

—কেন?

—দুধ পায় নাই, খাইতা পায় নাই।

—শুধু তা না। আল্লাও ওদের দুনিয়ায় রাখতে চায়নি।

একদম হঠাৎ জিভ-খসা ব্যক্তির মতো মাদবর নীরব হয়ে গেলেও বাকশক্তিসঞ্চয়ে তার বিলম্ব ঘটেনি এবং তখনই সে প্রশ্ন করেছিল,—দুধের বাচ্চা দুধের অভাবে মরছে। আপনি কন আল্লার মর্জি?

এমন দুঃসাহস মোহাম্মদ আলীর প্রত্যাশায় নথীভুক্ত থাকবে সে ভাবতে পারেনি বিধায় চোট সামলে চোঁট মেরেছিল,—আপনি বুড়া মানুষ, বুঝবেন না। পবিত্র পতঙ্গ। ছোকরারা চোরাগুপ্তা মারছে। আল্লার হয়তো তা ইচ্ছা নয়। গজব (অভিসম্পাত) কি সাধে আসে?

—কিন্তু কবি-মহাশয়—

—বলেন—।

—আপনি দ্যাখছেন—।

—কী—।

—বাপ-মার ভিটা ছাইড়া কতো মানুষে চইলা গেল।

—হ্যাঁ দেখেছি।

—হেরা জানে না কোথায় যাইতাছে। হগ্‌গলে (সকলে) পোকার চাপে মইরব।

—আপনি ওদের বোঝাননি?

—কতো কইছি, হুনে কই।

—কেন শোনে না?

—হুজুর, আমি তাগোর পেট ক্যামনে সামাল দিমু।

আত্মজয়ের উল্লাসে হাসতে গিয়ে আবার ভারসাম্য-আয়ত্তে, কবি জবাব দিয়েছিল,—এই দেখেন —পেট আবার পেটের কথা। অথচ মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনি পেটের কথা তুলছেন।

—হুজুর, পেটও আল্লায় দিছেন। আমার কইতে দোষ?

মাদবরের গলা ঈষৎ চড়ে গিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে লজ্জিত না হয়ে পারেনি। তা চাপা দিতেই অতি-খাদ কণ্ঠেই পরমুহূর্তে মরব,—পেট না হয় বাদ দিলাম। খাওন তো বাদ যাইব না। হেরা যায় ডরে।

—তা বলতে পারেন, ওরা যায় ভয়ে, ডরে।

—তা ঠিক।

—এই হচ্ছে কথা। মাঠে মরার চেয়ে ঘরে মরা ভাল।

—আজ্ঞে—।

—ওরা তা বুঝল না।

—না।

—বুঝলেন, সবুর করতে পারছে না।

—জী, হাঁ।

—আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন। তা আমি প্রথমেই বলেছি।

মাদবর সেদিন মাথা হেঁট করেছিল, মনে মনে ভেবেছিল, জ্ঞানের সড়ক হয়তো বহুত এবং চৌমাথায় সংখ্যা এত যে, শেষে কোনদিকে যাব—স্থির করা কেবল কঠিন নয়, খোদ জ্ঞানও সেখানে হালে পানী পায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন পাগ্‌লা মেহেরালীর মতো চিৎকার দীচ্ছিল (যদি সামনাসামনি কিছু বলেনি, বাইরে এসে বিড়বিড় করলে) এবং ঝুটে-হ্যায়-ঝুটে-হ্যায়-রবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত—শুনতে পাচ্ছিল। আরো বয়সে বৃদ্ধ, তবু অগ্রজসুলভ প্রাচীন রেস্তা আদরকে ধারিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুরত মণ্ডলের আলিঙ্গনের মধ্যে—যখন সেই জরা কণ্ঠ গম্‌গমিয়ে উঠল,—মাদবর ভাই, আমি অন্ধ। অন্ধত্ব আমার কাছে অভিশাপ নয়। আমাকে আর কিছুই দেখতে হচ্ছে না, কিছুই দেখতে হচ্ছে না—এত দুঃখ, এত জনের যন্ত্রণা। এ-ই আমার সান্ত্বনা, মাদবর-ভাই—।

এগারো

জ্ঞানের ধর্ম ঠিক জলের মতো। বহমানতা খুইয়ে ফেললে প্রাচীন রূপ রক্ষায় অসমর্থ। বরং আরো ময়লা গজবে আঁশের উপর এবং পরিশেষে, এই ক্রম চালু থাকলে চেনাই যাবে না, অজ্ঞানতা থেকে তার ফারাক কী? শুধু জ্ঞান নয়, সর্বপ্রকারের ভালমানুষিয়ানার ধারা একই খাতে চলে, যার অচলতা, অ-মেরামতি ঠিক তার বিপরীতের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে বসে অজানিতে। গোড়গ্রামের বিচ্ছিন্নতা নানা দিক থেকে তার সাবেক বনিয়াদ ধরে টান দিতে লাগল, যখন বিপদের প্রতিষেধ পর্যন্ত ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কারণ, মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন আর আক্কেলের পিঠে আরোহী নয়। বরং জঙ্গলে হাতীর পিঠে যেমন বানর বসে থাকে, উপরে চলাফেরার সুযোগে, এখানেও তা-ই ঘটে, যদি বিচারবুদ্ধিকে মর্কট কল্পনা করা যায়। একটা উদাহরণ দিলে অনেকের কাছে কিছু খোলাসা হতে পারে। সব না বুঝলেও মোটামুটি মাদবরের সাহায্য অন্তত বৃহৎ কোন ব্যাঘাত ঘটাতে অক্ষম।

পতঙ্গ কখন দাওয়ায় হামলা করবে, কখন যাবে বা আর কোন জায়গায় যেখানে চিল্‌তে সবুজ ঝিলিক দিতে পারে, তখন একটা পূর্ববর্তী সতর্কতা আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। তাই হঠাৎ বর্ষীয়ানদের মস্তিষ্ক-নিঃসৃত এবং মোহাম্মদ আলী অগ্রসরহ-সমর্থিত ফরমান হেঁকে উঠেছিল,—বাড়ির উঠান আশপাশ পরিষ্কার রাখো, কোন অসুবিধায় পড়বে না। 'সামনে সাফাই' অভিযানের একটা ফল দেখা গেল। সকালে অনেক ধুলো উড়তে লাগল। তার কারণ, সকলের একসঙ্গে ঝাঁটা-নাড়া—গৃহিণী, বিপত্নীক নিজে, অথবা দাসদাসী ইত্যাদির। এই ফেরে হয়তো স্বাভাবিক চালু না থাকার হেতু, নতুন কায়কের বিষ্ঠাহারের মতো সকলের উদ্যোগ, শক্তি রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সবকিছুর প্রবল আকারে আবির্ভাব ঘটে। ধুলোরও। অবিশ্যি গোড়গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশ যে নোংরা এমন দোষারোপ অচল, যদিও দু-চার ঘর ব্যতিক্রম থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ওই উপদেশ অনেকে গ্রহণ করেছিল এই ভেবে যে, কিসে-কী-হয় তা সব সময় কারো জানার কথা নয় এবং হেন পন্থায় একটা সুফল ফলেও যেতে পারে। সাফাইয়ের সঙ্গে পতঙ্গের সম্পর্ক-স্থাপন কার মাথায় খেলেছিল, তা অনুমানের ব্যাপার এইজন্যে যে তখন সবাই প্রতিষেধের আবিষ্কার-কর্তা বলে দাবি করবে। তাই বলা যেতে পারে, হয়তো পতঙ্গের তরফ থেকেই ঐ রহস্য-সূত্র পাওয়া, যখন দেখা

গেল, পরিষ্কার জায়গায় তাদের আসন পড়ে না। কার্যকারণের এই সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তালি বাজে না, যদি দুই হাত একত্র না হয় সমান তালে। বিপন্মুক্তির আশায় রোগীর কত কী কল্পনা এবং যে-যা বলে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে কেবল চিকিৎসা-সংকট সৃষ্টি করে না, আস্থা-হীনতার ফলে মৃত্যুকে আস্কারা দিয়ে বসে। রোগ যখন মুখ্য বিবেচ্য তখন ঔষধ-আবিষ্কারকর্তার নামধাম জাত-পাত নিয়ে বচসা পাকানো স্রেফ মূর্খতা ব্যতীত আর কোন বিশেষ্য দ্বারা ব্যক্ত হতে পারে? পরিচ্ছন্নতার অভিযান গ্যাস-বেলুনের মতো বিদীর্ণ, অন্য কোন দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে কিনা, তা কেউ ভেবে দেখেনি। কারণ, জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রাচীর চতুর্দিকে। অধিবাসীদের ব্যাহত-কৌতূহল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ঘোড়ার মতো হ্রেষা তোলে, ঠ্যাং তুলতে অক্ষম—যার সাহায্যে সে দৌড় দেবে এবং শিবিরে পৌঁছলে চিকিৎসকের চোখে ধরা পড়বে। বোধ হয়, নিদানে খুঁত থেকে গিয়েছিল অথবা কিসে-কী-হয় ইচ্ছামত ঘটে না, পতঙ্গের অরাজকতা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, চোরাগোপ্তা হত্যাপর্ব তেমনই অব্যাহত থাকল। পাহারার পর্যায় থেমে যাবে কী, তোড় আরও বেড়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সন্দেহ এবং দলাদলির ভিত পাকা হতে লাগল। সুতরাং ঐ সাফাই-পর্ব সোডা-পানির মতো অনেক বুদ্বুদ তুললে এবং যখন দেখা গেল, প্রতিষেধের গুলি ফাঁকা গেছে, তখন কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়। উপদেষ্টাগণ দেখলেন, নিজের চরকায় তৈলপ্রদান অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত অপরের উক্ত যন্ত্র ধরে টানাটানি অপেক্ষা এবং উপদেশকে যদি আদেশ বানাতে হয় অথবা আদেশকে উপদেশ তাহলে তার পেছনে অনেক লকড়ি নয় শুধু মগজও খরচ। কার এত সময় আছে বা হাজারটা চোখ আছে যে সদা সক্রিয় রাখবে। অতএব, যা চলে তা চলুক বা না চলুক—হঠাৎ-হঠাৎ দাবাড়ি দাও অথবা নৈশ চৌকিদারের মতো হেঁকে ওঠো যেন ভীরুজনের পিলে চমকায়। এইভাবে বিপন্মুক্তির তামাসায় বহু তরুলতা জেরবার হয়ে গিয়েছিল, তেমনই বহু মানুষ—যাদের সংখ্যা কমেছিল প্রাকৃতিক নিয়মে।

গফুর এবং তার বন্ধু রাখাল শেষে মন্তব্য করেছিল,—সামনে সাফাই মানে জোয়ানকাল থেকে একটাই শিখেছি—লোম—। উভয়ে হেসেছিল এবং আরো অনেকে যারা এই দঙ্গলে জমায়েত হয়ে সুখদুঃখ ধোনাই করছিল সহানুভূতির উত্তাপে। অস্বাভাবিক মনে হতে পারে এমন হাস্যচ্ছটা, দুর্দিনের খেয়াঘাটে যদি মাঝি এবং নৌকা কিছুই না থাকে এবং ওপারে বন্যাপ্লাবিত এলাকা থেকে পরিত্রাণের আশায় আর্ত হাঁক দেয় পরিবারবর্গ। শামুকের মতো অনেককেই শক্ত আবরণ সৃষ্টি করতে হয় চতুর্দিকে যেন বুকের ঠোকর কি অন্য উৎপাত সহজে প্রাণকেন্দ্রে না পৌঁছায়। গফুর, রাখাল, বুলান এমন অনেকে হাসবে বৈকি—যারা নিজেদের চারপাশে খোলস দিতে শিখেছিল এবং প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে ওঠা ছাড়া অন্য পথ নাস্তি—এমন চিন্তা যাদের মনে হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ।

গৌড়গ্রাম ক্রমশ বিহঙ্গশূন্য হয়ে গিয়েছিল। যারা এসব লক্ষ্য করেনি, তাদের উপর দোষারোপ চলে না। নিজের দিকে তাকিয়ে যদি অষ্টপ্রহর কেটে যায়, তখন অন্য দিকে চোখ ফেলার সময় কোথায়? গাছ থাকে, ফল থাকে, পাখি থাকে এবং যখন মানুষ থাকে গাছ থাকে—যদিও কাটা এবং রোপণও তার দায়িত্ব। এখানে নির্বিহঙ্গতার কারণ, আকাশবিহারের প্রয়োজন যদি না মেটে বরং পদে পদে বাধা পড়ে ডানায় বা পায়ে, তাহলে পতঙ্গের ঝড়ে নভোলোক নাকচ হয়ে যায় এবং যখন নীলিমার বিস্তৃতি নষ্টভ্রষ্ট, বায়ুর সীমানা সঙ্কোচন মারফত দীর্ঘশ্বাসের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ, তখন ওড়ার প্রশ্ন ক্রমশ প্রলাপ ও শেষে অবান্তর হতে থাকে। ঘুঘু ছেলে বা মেয়ে হারিয়ে কাঁদতে পারে সমগ্র দুপুর বা বিষণ্ণ বৈকাল এবং মানুষ তা থেকে সান্ত্বনা অথবা অর্থ একটা খুঁজে বের করে। সন্তান-হারানো পিতামাতা প্রাণীর ডাকে সহানুভূতি খুঁজে পায়। গৌড়গ্রাম বিহঙ্গহীন, কাককোজ্যোৎস্নার কথা ভাবতে পারে না যেমন প্রহর, বোঝে না পেঁচা কি শেয়ালের অভাবে। নেই, নেই, নেই।— নৌতির শনশেন বাতাস যখন উঠুক, যতই উঠুক বুকের শ্বাসে মিলতে গিয়ে ধাক্কা খাবে যেমন বাঁধা পুকুরে বন্যার জল—সব ঢুকলেও থাকতে অক্ষম।

গফুর ভাবতে শুরু করেছিল, গানের দল-গঠনের প্রাচীন স্মৃতি যদি ভর করে বসে ভূতের মতন সে কী নিয়ে গান বাঁধত (পাখি নেই) বা কে তার গান শুনত? অমন বাসনার প্রতি তার বিরাগ ছিল না কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষি, প্রায়ই বে-কাতর। পতঙ্গের গ্রাস, দাঁতের অন্ধকারে কাপড়চোপড় পর্যন্ত কুটিকুটি—এমন পরিস্থিতির বক্রতা ও জটিলতা। ট্যানাধারী গৃহিণী ভামিনী কামিনী রমণী রাণী...ফসল...বস্ত্র...ভিটেমাটি—এমনই একটানা অনুষঙ্গে জেরবার গফুর নিজের উপর মমতা-দর্শনের সুযোগই পেত না—যখন মেজাজের ঘোড়া দূরপাল্লার দৌড়ে মত্ত।

সেদিন সুরত মণ্ডলের চক্ষুকোটরের মতো অন্ধকারে ঘর, গফুরের ঘর, ডুবে ছিল, একথা গোধূলি-সংলগ্ন সন্ধ্যায় বলতে কিছু দ্বিধা থাকা উচিত। কিন্তু পিদিম পর্যন্ত ছিল না যখন, তখন কোন মন্তব্যই আর অশোভন নয় বিধায় গফুর পরিস্থিতি যাচাই করতে এগোয়নি। ভিজা কাপড় শুকাতে দিয়ে অন্ধকারে এমন বসে থাকে স্ত্রী সখিনা, দিগম্বরীর আদিম সংস্করণ, যার প্রাণ ধড়ে নয় আলনায়—যেখানে বস্ত্র সজীবতা পেয়েছে রমণীর হাতে।

—কুথা বইস্যা?

গফুরের এমন অন্ধকার-প্রীতির হেতু ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন যদি থাকত, বরং মঙ্গল ছিল। রসিকতা গফুর অনেক কমিয়ে দিলেও কালেভদ্রে নিরন্ন স্মৃতির-চাগানে অতীত-সাঁতার—কিন্তু কোন কূলে তরী ভিড়ত, সে জানত না।

—কুথা বইস্যা?

বস্ত্রহীনতার লজ্জা ছিল গোপিনীদের বটে, তবু দুঃখ না থাকার হেতু ছিলেন স্বয়ং মুরারি, যিনি অভাবকে পূর্ণতার মর্যাদা দিতে সক্ষম। মজকুর ক্ষেত্রে যদি তেমন সুযোগের অবকাশ দেখা দিত, গফুর হয়তো আবার ডাক দিত,—কুথা বইস্যা? কিন্তু স্মৃতি যতই জোরদার হোক, বর্তমান নিষ্ক্রিয় বেতো ঘোড়া, তা মনে ঠাঁই দেওয়া মূর্খতা। গফুর আর বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং কর্মে মনোযোগের সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর স্থানভূমি যদি জানা থাকে, তখন হোঁচট খেতে হয়। এই ক্ষেত্রে ছোট্ট ঘরে একটা মাটির পেয়ালাও যদি ভাঙে, ক্ষতিপূরণ অনেক কিছু ধরে টান মারবে, যার পরিণামে আর যা-ই হোক, ভালবাসার ফুল ধরবে না। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং উত্তাপ, যে-দুই উপাদান সেখানে বর্তমান, তার খোঁজ করা যেতে পারে। গফুর চিন্তা করছিল, কান-খাড়া—যদ্দুর সম্ভব উৎকর্ণ, যদিও বাইরে কয়েকটা ঝিল্লী বেশ তারস্বরে ডেকে-ডেকে বাগড়া দিচ্ছিল। উত্তাপের কথা, গফুরের মনে উদয় হওয়ার কোন কারণ ছিল না। আধপেট উপোস যারা থাকে, তাদের শরীরের তাপমাত্রা, একমাত্র জ্বর ব্যতীত, আর কদ্দুর এগোতে পারে? পিদিমের খোঁজ আরো দুরূহ এইজন্যে, সখিনা তার ভাটিতে যেদিন কাপড় শুকানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, সেদিনই সে সতর্ক হয়েছিল, এই ঢ্যাটা স্বামী থেকে রেহাই পেতে আলোর হাতিয়ারটা লুকিয়ে রাখা দরকার যেন সহজে কেউ নাগাল না পায়। গফুর সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়, যদিও আরো কয়েকবার অতি মোলায়েম কণ্ঠেই সে ডাক দিয়েছিল,—কুথা বইস্যা আছো? ছোট ঘর। একবার হাতড়ালেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে—গফুর এই সমস্যা-সমাধান জানলেও সহজে ঘৃত-উত্থাপনের পন্থায় বিশ্বাসী ছিল। একবার সামান্য হাত বাড়িয়ে সে পেছিয়ে নিয়েছিল এই ভেবে যে, হয়তো মেজাজ ভাল থাকলে কাপড় ছাড়াই অভীষ্ট সামগ্রী বুকে এসে বাঁধা পড়বে এবং ফিসফিস-রব তুলবে,—দরজা বাইন্দা থুইছ ত? (খিল লাগিয়েছ ত)। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে, শেষ-মাথা থেকে লোকে গোড়ার দিকে এগোয় কখনও স্মৃতির সাহায্যে, কখনও আগেকার কর্মের ধারায়,

পাওয়ার একটা সম্ভাবনায়। গফুর অন্ধকারে রোমাঞ্চিত-দেহ ঠিক তেমনি ফিসফিস-শব্দে উচ্চারণ করেছিল,—দরজা বাইন্দা থুইছি। কিন্তু এই রীতির আশ্রয়-গ্রহণ খামখা। খামখা স্মৃতির উপর চোটপাট, যখন জানা কথা, অভীষ্ট বস্তু ভঙ্গুর এবং তা পাওয়া গেলেও আর আস্ত থাকবে না। গফুর বুঝেছিল, তার গুলি লক্ষ্যস্থলে লাগা দূরের কথা, রেঞ্জের ভেতরই যেতে পারেনি। তাই সে বার বার হাতের মুঠি বাঁধছিল আর খুলেছিল এবং অভ্যন্তরে-অভ্যন্তরে স্থির করছিল, যে-অভিমুখে সুরাহা প্রসারিত সেদিকে যাত্রাই যুক্তিযুক্ত। হন্তদন্ত কোন কিছু যখন অশোভন ঠেকে, অথচ বুকের মধ্যে সর্বপ্রকার গুরুগুরু-ডাক ঝঞ্ঝনা তোলে, তখন কর্তব্য সম্পর্কে বিমূঢ়তা না আসুক, হাত-পা সহজে এগোয় না। এই জড়তা যতটা বাইরের ততটা ভেতরের এবং উভয়ের সমাহার বিদ্যমান বিধায় অমন ক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং পশ্চাদপসরণের অনুপাত সমান। পুনরায় উৎকর্ণ গফুর কোন শব্দ-ধরার প্রার্থনায় ঘাড়ের রগ্ (শিরা) সাধারণ ত্বক-সমতল থেকে অনেকখানি ঊর্ধ্বে তুলে ফেললেও তাতে কিছু স্বাক্ষর পড়ল না—যেন বিকল রাডারের দশা। কানামাছি খেলার মতো অন্ধত্ব অন্ধকার পূর্ণ করে দিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে চোর ধরা সহজ ছিল না। গফুর সিদ্ধান্ত-সংকটের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল খুব ভয়ে ভয়ে, ভাঙা সাঁকোর উপর পারার্থী বোঝা-মাথায় হাটুরের মতো। একবার হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে অনুভব করেছিল শূন্যে তার হাতের মুঠোয় যাদের ন্যায়—ব্যাদন-মুখী, কিন্তু গ্রাসে অনীহা ষোল আনা। শূন্য জাল তুলেছিল এই ধীবর যদিও পেশায় গাড়োয়ান এবং পৈতৃক দক্ষতায় সে অন্ধকার পার হয় গান গাইতে গাইতে। নারীদেহ এবং বিবস্ত্র কোথাও ওৎ-পাতা, যার তখন বাঘ বা সিংহের বুবুক্ষু হিংস্রতা থাকা উচিত ছিল শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু তখন শিকার এবং শিকারীর পার্থক্য আদৌ স্পষ্ট নয় বলে এক দিক যেন অন্ধকার স্বয়ং, অন্ধকারে প্রবিষ্ট বা বিলীন। হঠাৎ স্তিমিত-তেজ গফুর ভাবতে লেগেছিল, হয়তো সখিনা গরহাজির, কারো কাপড় চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে পাশের বাড়ি বা আর কোথাও। কিন্তু এমন সম্ভাবনার কল্পনা অসমীচীন এইজন্যে যে বাড়তি বস্ত্র দেওয়ার মতো ধারেকাছে কেউ নেই এবং যেখানে আছে—কোন মিয়াবাড়ি কি বাবুবাড়ি এত দূরে; অধিকন্তু সখিনার আত্মসম্মানজ্ঞান এত টনটনে হাত প্রসারণে অসমর্থ—তখন যন্ত্রণা বা প্রয়োজনীয়তার প্রসার যতই আসমান-স্পর্শী হোক। দেশলাই নেই, যেহেতু সঙ্গে বিড়ি ছিল না। একটু আলো, এক চিলতে আলো, খুব ধূসর অতি অস্পষ্ট—তাহলে আর এত ধৈর্যগিরি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। প্রাবাদিক কবন্ধ যেমন অন্ধ আবেগে-আক্রোশে কম-কম বাহু খোলে আর বন্ধ করে কঠিন আলিঙ্গনের পন্ধা-জালে শিকারকে পিষে ফেলতে, গফুর তেমনই ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ফলে, মেহনতের রসদ খেয়ে গেল, ইঁদুর পড়ল না। হয়তো লুকোচুরি-রত এক বিবস্ত্র রমণী। এই চিন্তা উদয়ের সঙ্গে ঝুপ অস্ত গেল, যার হেতু গফুরের নিকট স্পষ্ট : আহা, বয়স নেই, ক'মাসে বুড়িয়ে গেছে সখিনা। ঘরের একদম উত্তর কোণ ঘেঁষে একটু সামান্য জায়গা বারান্দার মতো বের করা ছিল বড় কুলুঙ্গির মতো এত বড় যে একটা ছ-ফুট লম্বা মানুষ স্বচ্ছন্দে খাড়া দাঁড়াতে পারে (বাড়ির গৃহিণী বলত, গরিব মানুষের ঘরের মধ্যে মসজিদ) এবং প্রয়োজনকালে ঘুঁটে, বস্তা বা ঐজাতীয় কিছু রাখা যায়। এতক্ষণ মশারির মতো ওই কুঠরির কথা গফুরের খেয়ালে আসেনি, বোধ হয়, স্ত্রী নামকরণ-অনুযায়ী সে নামাজী নয় বলে অথবা নিরক্ষরতা-হেতু আরবী শব্দ উচ্চারণে জিভের ডগা গররাজি বিধায়। গফুর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার পর সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল, যা নিতান্ত দৈবী ব্যাপার। হ-য-র-ল-ব লোয়াজিমা যেখানে থাকে, সেখানে বাড়ির গৃহিণী আত্মগোপন করবে—ভাবা যায় না। গফুর গুনগুন সুর ভাঁজছিল যখন মানুষ অনাহার-অনিদ্রা প্রেমের কাছে শুধু তুচ্ছ হয়ে গেল না, তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার স্তর থেকে নিচে নামতে-নামতে একটি মাত্র লয়ে তখন লুপ্ত। তাই গফুর

যে নিজেই লয়-প্রাপ্ত এতক্ষণ অধৈর্যের গঙ্গায় মজ্জমান ছিল, ভেসে উঠল আলতো সমীরের সঙ্গ-সুধায় এবং হাত নয়, দুটো আঙুল শুধু বাড়িয়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না তা স্পর্শ করে একটা স্তনের চুচুক—গোল এবং নরম, অতি নরম, সন্তানের সর্বদৌরাত্ম্যবঞ্চিত। সাপের গায়েও হাত পড়লে হয়তো এত দ্রুত আঙুল পেছিয়ে নিতে পারত না গফুর যেভাবে তার পশ্চাদপসরণ ঘটল। যেন সব অতৃপ্তিজাত কশাঘাত শুরু হয়েছিল তখনই। কিন্তু তৎমুহূর্তেই সে আঙুলের ডগা লাউডগার মতো, এখানে যদিও আলো নয়, বুকের দিকে ধাবিত করে—অতি শ্লথগতি, অতি মন্থর, এগোচ্ছে কি এগোচ্ছে না এমনই পারম্পর্য। পুনরায় পশ্চাদপসরণের সময় দুই জঙ্ঘামধ্যস্থিত বদ্বীপে যখন আঙুল লাগল, তখন গফুর অদৃশ্যশক্তি-আকর্ষিত যেন রকেটের কোন দাহ্য রসায়ন হঠাৎ জ্বলে উঠল না শুধু, গতির তোড়ে দিকভ্রান্ত আলিঙ্গনের খেপ্‌লা-জাল অনেকদূর ছড়িয়ে দ্রুত শামুক-মুখের মতো বন্ধ হয়ে গেল। ধরা পড়েছিল, বক্ষ নয় কটিদেশ যেখানে ইনামের মুখ ঠেকে গিয়েছিল এবং তার পটল (বেঁটেখাটো নাদুসনুদুস সখিনার স্বামিপ্রদত্ত নাম) যেন নিমেষে শালবৃক্ষের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, তারই কচি শাখার মতো দোদুল, যেমন সিকেয় হাঁড়ি দোলে, দুলছিল, হিন্দোল-হিন্দোল রাগ হোলির উৎসবে। অস্বাভাবিকতার ধাক্কা গফুর সামলে উঠেছিল কি ওঠেনি এমন বাছবিচারের অবান্তরতার ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, সে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীদের পিদিম (যার সামনে বসে একজন তামাক খাচ্ছিল, এবং এবং সহসা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে চিৎকার পেড়েছিল, কে—কে?) এনে দেখেছিল গফুর—না দেখেনি, না দেখেছিল : তার সখিনা আপন মহিমার রঙে কতো ঊর্ধ্বে উঠে গেছে এবং ঝুলছে সেই ভেজা বস্ত্রের সাহায্যে কড়িবাঁশ-সংলগ্ন। যে-বস্ত্র তার লজ্জা নিবারণ করত, সেদিন তা রমণীর তাবৎ লজ্জা কেড়ে নিয়েছিল অথবা ঢেকে দিয়েছিল ঠান্ডা নৈঃশব্দ্যে, হিম-তুষার শৈত্যে।

বারো

জমা-শূন্যে এবং মৃত্যু-খরচে বোঝাই জাবদা-খাতায় পরিসংখ্যানের নিয়মানুসারে শতকরা অনুপাত হ্রাস পায় গুরুত্বের দিক থেকে। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি এমন ক্ষেত্রে বুদ্বুদ উত্থাপন করে বটে, কিন্তু তা সমজাতীয় বহু ফেনার সান্নিধ্যে আর তেমন লক্ষণীয় বা বৈচিত্র্যে মোহনীয় থাকে না। অনেক অভাগা একত্রিত হলে সাগর শুকিয়ে থাকে আগে থেকে এবং জেরবার চোখের পলকে জলশূন্যতার ভূমিকা থেকে তা রেহাই পায়। গফুরকে ব্যাপারটা বুঝতে হয়নি। পরিস্থিতি তার কাছে এমন স্পষ্টতা অবলম্বন করেছিল যে তার মনে হয়েছিল, ঘাড়ে বোঝা হালকা বিধায় সে যত্রতত্র জান-কবুল যে-কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারবে এবং পিছু-হটা জানবে না। দুই বিপরীত কাঠি তাকে যুগপৎ একই সময়ে ঘুম পাড়াত আবার জাগিয়ে দিত সহজ স্পর্শ মারফত, যখন সে অনুভব করত, সুখ-দুঃখের মোকাবিলার চেয়ে সহজ আর কিছু নেই দুনিয়ায়। অনুপার্জন-জাত অনিশ্চয়তা পূর্বে তাকে কাবু করে ফেলত গৃহপানে দৃষ্টিপাতের ফলে এবং একটা সোয়াস্তি তখন এমন খোঁচা দিত যে, তার কোন মতামত আছে কোন বিষয়ে তা সে বুঝে উঠতে পারত না। মাদবরের উপদেশ সে নীরবে পালন করেছিল। যেহেতু সে কারো উপর হুকুম চালায় না, বরং কাছে টেনে দূরগমনের পন্থা বাতলায়। এমন ক্ষেত্রে মতামতের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। তা গফুর জানলেও বিনয়ে একদম ঘাসে রূপান্তরিত হতে-হতে হঠাৎ তার ভেতর সাপ পুষে ফেলত। এমন কয়েকবার ঘটেছে। সেকথা আর ধর্তব্যের মধ্যে, যেহেতু অতীতের ব্যাপার, মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু পরে সে নিজের মধ্যেই শক্তি অনুভব করছিল, যা মুরুব্বিদের মুখেও সব ব্যাপার তলিয়ে দেখার পক্ষপাতী। ঠিক

বাচালতা নয়, সবকিছু বোঝার জন্যে আগ্রহ, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও—যা ভেতরে ঘাই তোলে এবং পাঁড়া দেয়—এমন অস্থিরতা নতুনভাবে স্থিতি পেয়েছিল তার হালচালে। নিজের স্ত্রীর শোকবিরহ বিস্মৃতির গর্ভে জমা রেখে দেওয়ার হেতু এই যে, এমন যন্ত্রণার সঙ্গে তখন বহুজনেরই পরিচয় এবং তা সংখ্যায় বাড়ছিল, আদৌ হ্রাস পাচ্ছিল না। কিন্তু শোক যখন শ্রুধার ভিত্তি-উত্থিত এবং জানার আগ্রহ-কৌতূহল যখন অপরিসীম অথচ উৎস রুদ্ধ, তখন যে-আঘাত আসে তার কাছে প্রেমের লাভ-লোকসান তেমন নিদারুণ মনে হয় কি? কারণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু সান্নিধ্যের অভাব ধাক্কা মারে, যে-জায়গায় প্রথম ক্ষেত্রে ওই বিয়োগ ছাড়াও অনুভূত হয় একটা মানুষের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল-সৌরভের অনুপস্থিতি। সকলের জানা, গন্ধ ছাড়া পরিবেশের অপচ্ছেদ ঘটে না—শুধু স্বাদের তারতম্য আরো উৎকটরূপে দেখা দেয়। সদ্যকাটা টাটকা শশার গন্ধ শুধু বনজ-রসায়নের ব্যাপার নয়, যারা বোঝে মনজ আনন্দ, তাদের নিকট আর বয়ান বাহুল্য। গফুরের সকল তেজ, শক্তি একদিন এমন মিইয়ে গিয়েছিল সে ভাবতেই পারেনি, ঘাস আহারের মতো উত্থান-শক্তি আবার খুঁজে পাবে। পুরাতন দিনের কথা চোখের সামনে তুলে ধরতে সে শুধু অনিচ্ছুক নয়, উপরন্তু বিড়াল যেমন বিষ্ঠাত্যাগের পর চাপা দেয় এবং ভাসাভাসা চাপা নয়, বরং ধুলোর মধ্যে অক্ষান্ত ডুবিয়ে ছাড়ে, গফুর তেমনই পশ্চাদ্গহণে বাধ্য হয়েছিল বহুৎ যন্ত্রণাসহ—যা সখিনার মৃত্যু-জাত মর্মঘাতের নিকট তুচ্ছ। তখন কেবল সুরত মণ্ডলের কাছেই গফুর বসে থাকত একদম চুপচাপ অথবা বর্ষীয়ানের রেখাঙ্কিত লোল-চাম করস্পর্শের নিচে সেই মাত্তৈঃ মন্ত্র শুনত, যা সর্ববেদনাহর নিমেষে নিমেষে, যদিও জের সদা-বর্তমান। তখন কৃতজ্ঞতা সেই আধিপত্য বিস্তার করে বসত, যার ফলে শুধু মাথা অবনত নয়, এক প্রকারের নিষ্ক্রিয়তাও ভর করত। নিঃসম্পর্কতার হাতে মার খাওয়ার দিনে অমন দোসর চিরদিনই আশীর্বাদ। অনাহার, উপবাস, নানা কৃচ্ছ্রতার উপর মৃত্যুর করাতে দ্বিখণ্ডিত গফুর প্রায়ই ভাবত, সে চারপাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিল শুধু সুরত মণ্ডল দাদুর কল্যাণে, হ্যাঁ, তারই পাকা চুলের মতো শুভ্র হৃদয়ের সৌরভে। বাইরে নানা কাজ, যদিও গাড়ি বন্ধ—ফাইফরমাস বা মুনিশের কাজ, যখন যা পাওয়া যায় কিছু করতে হত বৈকি। ব্যস্ত থাকলেও এক-একবার সব ছেড়েছুড়ে সে দৌড় দিতে চাইত, সুরত মণ্ডল যেখানে প্রায়ান্ধ, নিজের তালপাতায় লেখেন, লেখন এবং তার পূর্বে গুনগুন করেন নিজের মনে, সময় সময় মাথা দুলিয়ে অতি সন্তর্পণে যেন ঘাড় তা থেকে ছুটে না যায়, বৃদ্ধ বয়সে যে-ভয়ও থাকে। দুই পাড়ার দলাদলিতে একটা গুজব খুব দানা বেঁধেছিল যে, পতপোর লাশ এখানে ওখানে মাঝে মাঝে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার পেছনে গফুর, রাখাল, বুলান এবং আরো এইজাতীয় ছোকরাদের যোগসাজস বা হাতযশ আছে, যার ফলে অমন ঘটনা এবং গুপ্ত ঘটনা ঘটছে, সহজে ধরার উপায় থাকছে না। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম এবং আরো গ্রাম-হিতাকাঙ্ক্ষীরা এইজন্যে এত চিন্তিত যে কয়েকবার সকলকে ডাকিয়ে তারা অনেক উপদেশ এবং সতর্ক করে দিয়েছিল, এমন অবশ্য কাজ আখেরে পস্তানির মালমশলা, প্রলয় সন্নিকট করে এবং একজনের পাপে তখন লক্ষজন ভোগে। কিন্তু সন্দেহ জিনিসটা চাপা থাকার কারণ, চাপা থেকেই জন্ম বিধাম্র হাটেবাজারে চালু হলেও হাঁড়ির মতো ভগ্ন হতে জানে না। এই পর্যায়ে একটা সুবিধা এই যে তখন অপরাধ-নিরপরাধ এমন একাকার হয়ে যায় (পরস্পর কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি আবহাওয়া—তা-ও চাপা) সত্যিকার দোষী জন পার পেয়ে যেতে পারে এবং তা খুব সচ্ছন্দেই ঘটে। যেহেতু কেউ পায়ের মাটি সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকে না। এইসব অপরাধের রাজো, তদুপরি স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত, মনের যে অবস্থা থাকে তা বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই গঠন করে না এবং যদিও স্বাভাবিকতার কিছু বায়ু টেনে আনে, তার মধ্যে খাদ থাকে ষোল আনা। গফুর কিন্তু রেহাই পেয়েছিল নানা

দিকের যন্ত্রণা থেকে একমাত্র দিকে, যেখানে প্রতিশোধের স্পৃহা ধিকিধিকি তুষানলের মতো জ্বললেও দাউদাউ রূপগ্রহণের অপেক্ষার্থী, যখন সময় আসে বা সুযোগ তৈরি হয় আপনা-আপনি। সুরত মণ্ডলের কাছে তার যাতায়াত অনেক কমে গিয়েছিল। হেতু—, সে তখন এমন মানসিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যেখানে আর যেন কারো আশ্রয় প্রয়োজন নেই এবং মাঝে মাঝে ধাক্কা দিলেও আর তাকে এদিক ওদিক হেলতে-টলতে হয় না। ধীরে ধীরেই সে নিজেকে এমন আত্মস্থ দশায় এনেছিল না শুধু, নিজেকে বুঝতে চাইত সে, যদিও তার ইলেম নেই বা তেমন কোন হাতিয়ার নেই যা তার মদত দিতে সক্ষম। কিন্তু চতুর্দিকে চেয়ে-চেয়ে এবং পাড়াপড়শীদের জীবনের শরিক-রূপে সে কতগুলো সহজ বিশ্বাস রপ্ত করেছিল যা তাকে যেন পথ দেখাত, যখন অন্ধকারে হামাগুড়ি টেনে চলার কথা শুধু। হঠাৎ একদিন সে অতি বিচলিত হয়ে উঠল, তারই এক আত্মীয় খবর দিয়ে গিয়েছিল সুরত মণ্ডল দাদু নাকি পাগল হয়ে গেছে—বদ্ধ উন্মাদ। প্রাচীন রেস্তা নয়, স্মৃতির প্রবল ধাক্কায় গফুরের সেই মূষিকের দশা—যে জলভারে গর্তে পড়েও আর সাঁতার কাটেনি শুধু নিঃশ্বাস বাঁচানোর জন্যে। সংবাদের কতো রকম মাহাত্ম্য আছে, সেদিন গফুরের আর উপলব্ধির তেমন তাগদ ছিল না। তাই বোধ হয় এক দৌড় দিয়েছিল মণ্ডলপাড়ার দিকে যেখানে সকল তাপ-হরণ ছায়া তখনও তার জন্যে অপেক্ষার্থী—চিরদিন যা পেয়ে এসেছে স্বাভাবিক দাবির মতো। থমকে দাঁড়িয়েছিল গফুর সুরত মণ্ডলের অতি-চেনা ছোট বৈঠকখানা-ঘরে এবং তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যখন সে দেখলে, বৃদ্ধ কাঁবয়াল একটা মাদুরের উপর (কাঁথা বিছানো ছিল কিনা দেখেনি) মুখ গুঁজে দুই হাতে কী যেন খুঁজছেন, খুঁজছেন। দুর্বল পেশীর সঞ্চালন শুধু অসহযোগিতার আঙুলগুলো নড়াছিল, কিন্তু তেমন দ্রুত নয়—শরীরের ঝাঁকুনিতে স্পষ্ট।

—দাদু!

বসে পড়েছিল গফুর একপাশে, যদিও পার্শ্বস্থ আত্মীয় স-বারণ জানিয়ে দিয়েছিল, গায়ে হাত পড়লে বৃদ্ধ আরো চিৎকার দেবে বা গোঙানি শুরু করবে—যার ফল দুর্বলতা ও মৃত্যুকে আরো সন্নিকটে পেঁাছে দেওয়া।

—দাদু!

একটু গলা চড়িয়ে দিয়েছিল গফুর। কিন্তু তার ডাক বোধ হয় অতদূর যায়নি, যার সুড়সুড়ি শব্দ হিসেবে বৃদ্ধের কানে কোন তরঙ্গ তুলবে।

—দাদু!

এক বিধবা আত্মীয় বাতাস করছিল খুব সাবধানে যেন পাখা রোগীর গায়ে লেগে একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে, যার পরিণতির মাত্রা প্রাণঘাতী। আর ইহকালে হয়তো কোন জওয়াব পাওয়া যাবে না, এই ভেবে গফুর যখন চুপ করে গেল, তার দুই চোখ ডাক দিতে লাগল নিঃশব্দে দুই পক্ষ্ম থেকে পানি ঝরিয়ে, কখনও বা সব দৃষ্টিপথের আচ্ছন্নতা মারফত।

—দাদু! ডাক, ডাক, ডাক দে! কিন্তু কে কাকে ডাক দেবে, যখন এক-একজন নিজের কর্ণপটে একই দিকপ্রাপ্ত শব্দের সড়ক ধরে হাঁটতে থাকে এবং তা পরিত্যাগের কোন উপায় বা পন্থা পাকড়াতে পারে না। কাছাকাছি উপবিষ্ট গফুর দাদুর মাদুরে গোঁজা মুখ সোজা করে দিতে গিয়ে বিধবার কাছ থেকে আবার বাধা পেয়েছিল—সেই আগেকার যুক্তি। অবিশ্যি অমূলক নয়: কিছু করতে যেয়ো না, বাবা। যখন নিজের মনে কিছু চায় বা বলে তখন এগিও।

দাদু!—বিধবার বারণ ঠেলে অতি আলতোভাবে মণ্ডলের পিঠে হাত রাখা-মাত্র মনে হয়েছিল, বৃদ্ধ যেন স্পর্শ-সচেতন নিজের সড়ক ছেড়ে অন্যদিকে পা-ফেলার মতলব তৎমুহূর্তে আঁটলেন

এবং দৃঢ়-সংকল্প। হঠাৎ একটা হাত সশব্দে আছড়ে ফেলে, বোঝা যায় বেশ শক্তি দ্বারা, মণ্ডল চিৎকার দিয়ে উঠেছিল,—পাতা দাও, আমার তালপাতা দাও...তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে... তারি পাতা দাও...পাতা...।

পাতা!—গফুর যেন ধুয়া ধরেছিল, তেমনই স্বরে উচ্চারণ, বিধবার দিকে তাকিয়েছিল, কোন ব্যাখ্যা থাকলে তৎক্ষণাৎ দিতে।

—পাতা...আমার পাতা দাও...পাতা...সব খেয়ে ফেলেছে...সব...পাতা দাও, আমি লিখব,... কালি দাও, কলম দাও। বৃদ্ধ মণ্ডল তৃষিত হাতের তালু যথারীতি চিৎ রাখে বটে, কিন্তু শীর্ণ শিরাগুলো স্থির থাকে না, বরং দেখা গেল, থরথর কাঁপছিল, কাঁপছিল—যেখানে আকাঙ্ক্ষার তাগিদ এত প্রচণ্ড যে শিরা ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে, যদি নিকটে কোথাও দু-এক ফোঁটা অবশিষ্ট থাকে।

—দাও—। দিলে না, দিবি না হারামজাদী... দে দে...(ডাহা অশ্রাব্য গালাগাল। শ্রোতাদ্বয় কানে আঙুল দেয় না, লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে কৃপার দৃষ্টি মাটির উপর ফেলে, আসল পাত্রের উপর বর্ষণে অসমর্থ) দে—দে—। আমার পাতা, আমি লিখব গান...গান...লিখে যাব আর গাইব... কতো...লোক শুনবে, হাসবে, যেখানে কাঁদার কাঁদবে...দে—দে—তোদের সুখদুঃখই আমার গান... পাতা কোথায়?...আর গান গাইব না...ভাটির দেশে বিয়া করছিলাম...ও রংগিলা নায়ের মাঝি... পাতা, পাতা...।

মণ্ডলের চিৎকার মাঝে মাঝে গলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল—যেন গোটা এলাকা তখনই ভূকম্পনে কাঁপবে, যখন কিছুই আর খাড়া বা স্থির থাকবে না। গফুর স্তব্ধতার মধ্যে ঈষৎ থোঁটা পুঁতে, বিধবা মহিলাকে সম্বোধন দ্বারা জানার কৌতূহলী, পাতা দিলেই কি দাদুকে চিৎকার থেকে নিবৃত্ত করা যায়—যা তার আয়ুর গায়ে কিছুটা বেমেয়াদী সুতো লাগাতে পারে। কিন্তু জানা গেল, আর কোন তালপাতা-সদৃশ পাতা যতই দাও, বৃদ্ধ ঠিক ধরে ফেলে, এবং তাকে প্রতারিত করা অত সহজ নয়।

আদ্য কালি জাদ্য কালি
কালি ঝলমল করে
সব দোয়াতের ঘন কালি
আমার দোয়াতে পড়ে।

হঠাৎ ছড়া গেয়ে উঠল শীর্ণকণ্ঠ মণ্ডল, একদা বাল্যকালে পাঠশালে অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে লেখনী নেড়ে-নেড়ে কালির ঘনত্বের জন্য যে প্রয়াস পেত তারি জীর্ণ সংস্করণ—আদল আছে, কিন্তু ভেতরে আর মাদল বাজে না।

—পাতা...পাতা...। দুই শব্দে নিবদ্ধ চাহিদা ততক্ষণে আর তারস্বরে পৌঁছায় না। তা প্রতীয়মান, বৃদ্ধের কণ্ঠ-শিরার দিকে চেয়ে যা নীল-নীল লালচে সুতলী সাপের মতো নড়ছিল ঈষৎ কম্পনে এদিক-ওদিক।

বিধবার বয়ানে পরিষ্কার : সমস্ত তালপত্র পতঙ্গের জঠর-গহ্বরে প্রবেশ-হেতু আর তেমন কোন যোগানদানের সম্ভাবনা রুদ্ধ বিধায় বৃদ্ধের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দেয় এবং গান-বাঁধা ও তা লিপিবদ্ধ রাখার অভাবে এমন ঘটেছে—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আত্মীয়া আরো কিছু কথনের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ সচিৎকার মাদুরের ভেতর গোঁজা মুখ তুলে চিৎ হয়ে পড়ল না শুধু, দুই চোখ মেলেও দুই পার্শ্ববর্তীদের দেখতে লাগল অদ্ভুত এক দৃষ্টির সাহায্যে, যেন কারো মুখ অবলোকন-মারফত সন্তুষ্ট নয়, বরং আরো গভীরে দেখার প্রয়াসী—যেখানে মানুষের সব সাধনা, কামনা, মায়া-মমতা একান্তে লুক্কায়িত থাকে। অতঃপর বিড়বিড় শব্দে সজ্জিত

ও সঞ্চালিত দুই ঠোঁট। তখন স্বাভাবিকভাবে বোধ হয় না, হয়তো ঈষৎ মনোযোগ দিলে শোনা যেত তার বক্তব্য : লিখতে দাও...গান বাঁধতে দাও...পাতা দাও। বাঁধো আসর, আমি গান করব। তার আগে পাতা দাও...পাতা।

গফুর তখন বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, কান অতিমাত্রায় খাড়া, অর্থোদ্ধার-দুঃসাধ্য সব বিড়বিড়ানি শুনতে, যার মধ্যে মণ্ডলের জীবনের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল ছবি দেখা যাবে তৎমুহূর্তেই। কিন্তু ঠোঁটের কম্পন যখন থেমে এলো, ক্রমশ নিঃশব্দ, কোন শব্দই রইল না, চোখে যেন শ্রবণ জায়গা পেল, তখন শ্বাস উঠতে লাগল এবং মণ্ডলের গ্রীবা স্ফীত, স্ফীততর হতে আরম্ভ করল। আত্মীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জল আনতে গিয়েছিল, শব্দ-তৃষিত ওষ্ঠে তারল্য বর্ষণে, যার জানার কথা নয়—বাতাস অদৃশ্য, নির্বস্তুক এবং সলিল বস্তুত দৃশ্যমান। বিধবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মণ্ডল শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল আপন বুকের হাপর থেকে, যেখানে আর আয়াস ছিল বা ছিল না, তা গফুরেরও অপরিজ্ঞাত। সে তখন লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছিল ডুকরে-ডুকরে যেন সদ্য-মাতৃহারা বালক, দুই চক্ষু বন্ধ—যেহেতু আর কোন মৃত্যুর মুখদর্শনে সে অক্ষম।

[আগামীবারে সমাপ্য]

আ লো চ না

অতুল বসু স্মরণে

১৮৬৪ সালে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে যেসব বিদেশী শিল্পী ট্রেনাররূপে এদেশে আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী কি শিল্পশাস্ত্রী কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। এদেশে বাস্তববাদী চিত্রকলার ভিত্তিরচনায় এঁদের প্রচেষ্টাকে লঘু করে দেখানো উদ্দেশ্য নয় আমার, কিন্তু একথা বলা বোধ হয় অমার্জনীয় হবে না যে, প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় শিল্পভুবনে যে নতুন নতুন তরঙ্গের অভিঘাত, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা অধ্যয়নলব্ধ কোন পরিচয়ই ছিল না এঁদের। এই নিষ্প্রসবা অবস্থা যখন এদেশের আর্ট স্কুলগুলির, তখনই—১৮৯৮ সালে—অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ই বি হ্যাভেল, এবং সূচনা হল সেই আন্দোলনের আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যা ভারতশিল্পের পুনর্জাগরণ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। হ্যাভেলের অধ্যক্ষপদপ্রাপ্তি, অবনীন্দ্রনাথের উপাধ্যক্ষপদ স্বীকার, সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠা—আমাদের জাতীয় চেতনার অংশ এই ইতিহাসের পুনরুল্লেখ বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আত্মপ্রসাদের অনুষঙ্গরূপে আমরা ভুলেছি যে এই তথাকথিত ভারতশিল্পের জন্য বাস্তববাদী চিত্রশিল্পকে স্বীকার করতে হয়েছিল এক সমহে ক্ষতি।

এমনই এক সংশয়পীড়িত, অব্যবস্থিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এলেন আর্ট স্কুলের সেরা ছাত্র অতুল বসু। তখনও তাঁর স্বকীয় বিকাশের পথ চেনা হয়নি। আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারার সঙ্গে সৃষ্টিশীল প্রতীচ্য শিল্পকলার যোগাযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, '১৮৬০ থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯১০ সালে ইতালী থেকে প্রচারিত ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো অবধি যে নতুন ভাবধারা ইউরোপের সর্বত্র কবি দার্শনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন ঘটিয়েছিল তা অনেকটাই ইংরেজদের এড়িয়ে যায়। আমরাও তখন ভিসুয়াল লজ অব অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড রিয়ালিটি নিয়ে যেসব নতুন তথ্য চিত্রকলায় ব্যবহৃত হল, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারিনি। আর্ট স্কুলে শিক্ষাকালীন (১৯১৬-১৮) অবস্থায় আমি ঐসব কথা তো শুনিইনি, পরেও খোঁজ নিয়ে জানি যে আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীরা—কোথাও এসব জানবার সুযোগ পাননি।' (বাংলাদেশে রাজনীতি ও চিত্রকলার একশ বছর' : অমৃত, ১৪ বর্ষ; ১২ সংখ্যা)

সুতরাং, অভ্যাসজীর্ণ রেনেসাঁস চিত্রকলার যে পশ্চলস্রোতে আর্ট স্কুলের চক্রমণ, তার থেকে মুক্তিলাভ ছিল, প্রকৃত শিল্পী হবার প্রথম শর্ত। আর এই মুক্তিলাভের সুযোগও অতুল বসু পেলেন, ১৯২১ সালে, লন্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমীর ছাত্র হয়ে। ভিক্টোরীয় যুগ ও তার অবক্ষয়পীড়িত, অসার চিত্রকলার আয়ু ততদিনে অবসিত; মানে-হুইসলার-শিক্ষিত, বেলাস্কেজ-অনুপ্রাণিত ইংলন্ডে তখন ইমপ্রেশনিজম-এর জয়-জয়কার। এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ওয়াল্টার রিচার্ড সিকার্ট (Walter Richard Sickert ১৮৬০—), শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিশিল্পী জন সিঙ্গার সার্জেন্ট (John Singer Sargent, ১৮৫৬-১৯২৫)। এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, দ্রষ্টার অভিজ্ঞতায় বাহ্য বস্তুর রূপান্তর সাধনে আলোর ভূমিকা অসাধারণ। কোন জ্যামিতিক পরিমাপ নয়, আলো, হাঁ, আলোই সেই স্বর্ণসূত্র—যার সাহায্যে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে আপনা হতেই রচিত হয়ে ওঠে এক নির্মিতি বা কম্পোজিশন। অপিচ, কোন বস্তুর সংস্পর্শে আমাদের অক্ষিপটে প্রথম যা ধরা পড়ে—তা হল বস্তুর উপরিতলে ভাসমান আলোছায়ার এক অবিশ্রান্ত লুকোচুরি। এর ঘনত্ব,

ত্রিমাত্রিক অবস্থিতি বা গভীরতা—এককথায়, যা-কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার সুফল—তা সবই বস্তুর উপর আরোপিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। এবং হতে থাকে যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে আমাদের প্রথম পরিচয়ের চকিত আনন্দটুকুও। এই প্রথম পরিচয়ের আনন্দশিল্পে সৃজন করবার অভিপ্রায়েই ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা স্থাপত্যধর্মী চিত্রকলার স্থলে বরণ করলেন দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকলাকে। তাঁরা ঘোষণা করলেন ছবির কোন অংশবিশেষকে মুখ্য আকর্ষণ করে তোলা নয়, এক বিশেষ পরিবেশে 'এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের চপল এক মুহূর্তের অনুভূতি'র রূপায়ণ-ই শিল্পরচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'The Late Breakfast' ছবিটিকে এই ধরনের চিত্ররচনায় অতুল বসুর প্রথম প্রয়াস বলা যায়। চিত্ররচনার এই নতুন দর্শনের সঙ্গে তিনি প্রথম পরিচিত হলেন ওয়াল্টার রিচার্ড সিকার্টের মাধ্যমে।

ছবিটিতে দেখি মানুষ, আসবাব, তৈজস—কেউই এখানে অপ্রধান নয়। বরং যথাযথ স্থানে পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে এক পরিবেশ রচনাই যেন এদের কাজ। তেমনি সবকিছুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত এক নীলাভ আলো যেন নয়নমনে সঞ্চারিত করে যায় প্রভাতের এর সর্বব্যাপী প্রসন্নতা। 'The Late Breakfast' ছবিটিকে অতুল বসুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না হয়তো—শিল্পী নিজেই বলতেন ঐ ছবিটিতে 'artist in making'-কেই ভাল চেনা যায়—কিন্তু এইখানেই আমরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রথম পদসঞ্চার শুনতে পাই। এই ছবিটি শিল্পী অতুল বসুর জীবনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

সামগ্রিকভাবে ইমপ্রেশনিজম-এর তত্ত্বে তিনি শিক্ষালাভ করেন সিকার্ট-এর কাছে। পক্ষান্তরে, প্রতিকৃতি রচনার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন সার্জেন্ট-এর ছবির প্রদর্শনী দেখে। এর প্রথম ফল 'Study of a Head' ছবিটি। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর যে প্রদর্শকক্ষে অন্য সব ছবির সঙ্গে অতুল বসুর ছবিটিও স্থান পেয়েছে, সেখানে যে-কোন শিল্পজিজ্ঞাসু-ই প্রাক্-ইমপ্রেশনিস্ট এবং ইমপ্রেশনিস্ট ছবির পার্থক্য সহজেই অবহিত হতে পারবেন। অন্য সব ছবিতে দৃশ্যবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ক্রমিক চিত্রায়ণ-ই যখন রচনার মূল কৌশল, অতুল বসুর ছবিতে ছবিতে সমগ্র অবয়ব, তথা বেশবাস তখন একই আলোর আচ্ছাদনে বিধৃত। এই কারণেই ছবির কোন অংশকেই চিহ্নিত করার কোন প্রয়াস শিল্পী করেননি, আলোর সামান্য তারতম্য ঘটিয়েই তিনি পেরেছেন বস্তুর আভাস আনতে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গলবন্ধনী ও চুল, এইভাবেই—তুলির একটিমাত্র আঁচড়েই—বোঝানো সম্ভব হয়েছে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য। আলোর তারতম্যে বস্তুর আভাস সৃষ্টি করা,—শিল্পের এই অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতার শিক্ষালাভ ইমপ্রেশনিস্টরা অবশ্য করেন সপ্তদশ শতকের স্পেনীয় চিত্রকর বেলাসকেজ-এর কাছ থেকে। যে কালে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ক্লেরেস্কীয় চিত্রবিজ্ঞানের একাধিপত্য, বস্তুত, যে কালে লিওনার্দো-মাইকেল অ্যাঞ্জেলা প্রবর্তিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা ছিল প্রায় ধর্মদ্রোহিতা, সেই সময়েই বেলাসকেজ আদর্শ করেছিলেন ভেনেসীয় চিত্রকলার সূর্যকরোজ্জ্বল রূপকে। ফলত, তাঁর ছবিতে রেখার স্থান অধিকার করল বর্ণসুষমা, নির্ধারণার স্থলে এল ব্যঞ্জনা। সামান্য ইঙ্গিতে বস্তুর প্রতিভাস সৃষ্টি করার এই শিল্পচাতুর্য মানে (Manet) ও তাঁর পরবর্তী চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল বলেই তাঁরা বেলাসকেজ্-কে বলেছিলেন 'Painters' Painter'। অন্যদিকে শিল্পরসিকের কাছেও ধরা-না-ধরায় মেশা এই শিল্পের আকর্ষণও অপ্রতিরোধ্য।

এই শিল্পপদ্ধতিরই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করি অতুল বসুর পরবর্তী দুটি ছবিতে। 'J. N. B.' প্রতিকৃতিতে দেখি একমাত্র আলোর উদ্ভাসপতন ছাড়া বস্তুরূপকে বোঝানোর অন্য কোন উপায় সেখানে অবলম্বন করা হয়নি। কম্পমান আলোর এক বন্যায় যেন মানুষ, পশ্চাৎপট সবই

সেখানে ভাসমান; লম্বমান এক রেখা প্রতিফলিত হয়ে সে আলো নাসিকার তীক্ষ্ণতা, কখনও বা ওষ্ঠাধরের নমনীয়তা, কখনও বা চশমার বর্তুলভাব। আলো-ছায়ার রহস্যময় খেলার মধ্য দিয়ে প্রতিকৃতি ধরবার যে সার্থক প্রয়াস অতুল বসুর এই 'J. N. B.'-তে লক্ষ্য করি, তার একমাত্র তুলনা আমি পেয়েছি সার্জেন্ট-অঙ্কিত "Vernon Lee' ছবিটিতে।

এইখানেই উল্লেখ করা যায় তাঁর 'আত্ম-প্রতিকৃতি'-র—হলুদ-সবুজ ও অনতিস্পষ্ট বাদামী রঙের জমিতে জমিতে আঁকা সেই ছবিটি যা দেখে বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী ঈ একানভ্ বলেছিলেন—"He is not only an artist, but a master"। ভারতবর্ষে প্রতিকৃতিশিল্পের ইতিহাসে অনন্য-পূর্ব এইসব ছবির জন্যই অতুল বসু অমরত্ব দাবি করতে পারেন। এইসব সৃষ্টিই তাঁকে বসিয়েছে বেলাসকেজ্-মানে-গেইনস্‌বরো-সার্জেন্ট-উইলসন্ দীর-এর পাশেই এক আসনে। দ্রুত রঙ প্রয়োগের জন্য তুলি টানার এক বিশেষ কৌশল এঁদের ছবিতে লক্ষ্য করি। এরই ফলে ছবিগুলি পায় স্কেচসুলভ এক অসম্পূর্ণতা, যা ছবির আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সম্প্রতি কোন কোন সমালোচনায় এই বিশেষ শিল্পপদ্ধতিকে "Virtuoso School' or 'Brush stroke style of painting' বলে নিন্দা করার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। যেন নিছক কলাকৌশলের চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্যই এ ধরনের শিল্পপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্য-বস্তুর বিভিন্ন অংশকে এক আলোর তরঙ্গে মিলিয়ে, তথা বর্ণিকাভঙ্গে এক অপ্রস্তুতির ভাব রক্ষা করে, শিল্পী যেন দর্শককেও আমন্ত্রণ করেন আপাতসম্পূর্ণ ছবিকে নিজ মনে সম্পূর্ণ করে তুলতে। তিনি যেন আমাদেরও কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে যান, ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণতা দান করতে গিয়ে দ্রষ্টা নিজেই হয়ে ওঠেন স্রষ্টা। যে-কোন ব্যঞ্জনাধর্মী শিল্পের এই প্রধান গৌরব—প্রত্যেকের জন্যই তার নতুন নতুন সৃষ্টির, নব নব দিগন্ত বিস্তারের সুযোগ থাকে। দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই যে অদৃশ্যের ইশারা, পলাতক আলো-ছায়ার মধ্যেই যে অধরা মাধুরীর অমোঘ আহ্বান, সেই আহ্বানকেই যেন আমরা নতুন করে শুনতে পাই এঁদের ছবিতে। সেই অধরকে ধরবার সাধনায়—হয়তো বা নিষ্ফল সাধনায়—আমরাও যে উৎসুক হয়ে উঠি, সক্রিয় হয়ে ওঠে আমাদের বুদ্ধি, অনুভূতি, অতুল বসুর ছবিতে দর্শকের সেরা লাভ তাই। কিন্তু ব্যঞ্জনাসৃষ্টির এ কাজ শিল্পে খুব সহজ নয়। একাধারে বস্তুর রূপ রঙ ও বর্ণসমন্বয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য বিষয়েও যে সচেতনতা থাকলে এই ধরনের ব্যঞ্জনাধর্মী শিল্পসৃষ্টি সম্ভব, তা কেবলমাত্র প্রতিভাবান শিল্পীরই অধিগম্য। দৃশ্যবস্তু বিষয়ে যে অন্তঃসন্ধানী প্রত্যক্ষ জ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা, অতুল বসুর এইসব ছবিতে বাস্তবের উজ্জ্বল প্রতিভাস সৃষ্টি করেছে, সহজাত বোধ ও অনলস তপস্যার সে মিলনের দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা যতদিন না পাই, ততদিন, বলা বাহুল্য, শিল্পী হিসাবে অতুল বসুর আসন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ কিছু নয়, সে তো বিশেষ শিল্পদর্শনেরই বাহ্যিক প্রকাশমাত্র। বস্তুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যে সজীবতা, তাকেই শিল্পে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা। কিন্তু এই সজীবতা নিজ মনে উপলব্ধি করেন না যিনি, তাঁর শিল্পকর্মে এই বাণী নিতান্ত নিষ্প্রাণ থিওরিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। কিন্তু কতটুকু পারি আমরা দর্শনের সে আনন্দকে অক্ষুণ্ণ রাখতে? শিশু পারে; সামান্য স্পর্শসুযোগও তার হাসির উচ্ছ্বাসে, জানালা দিয়ে ঘরে ঠিকরে আসা আলোকে ধরবার নিষ্ফল প্রয়াসেও ব্যক্ত হয় পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম চিন্তাভারহীন পরিচয়ে তার আনন্দ। কিন্তু বয়স বাড়ে, পুঞ্জীভূত হতে থাকে আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও। নতুন পরিচয়েও আমরা আরোপ করি পূর্বতন অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। এমনি করেই রূপ-রঙ-প্রকাশের গৌরবে মহান পৃথিবীর দৃশ্যবস্তুগুলির মধ্যে আমরা টানি বৈষম্যের ভেদরেখা—এ সুন্দর, ও কুৎসিত।

সৌন্দর্যের যে ছবি, রঙের যে ঝরনা আমাদের চারপাশে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে

যাচ্ছে, কোন মতবাদের দড়ি দিয়ে কি তাকে বাঁধা যায়, না চেনা যায় তাকে নিজের পছন্দ করা চশমা নাকে পরে? তাকে পাবার জন্য মনকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়, আনন্দ পাবার ও আনন্দ দেবার একটি ইচ্ছা নিয়ে, শিশুর একটি সারল্যকে বুকের মধ্যে লালন করে। যদি বস্তুবিশ্বের সামনে উপস্থিত হতে পারি কেবলমাত্র দর্শন-শ্রবণকে পথপ্রদর্শক করে, তাহলে দেখব, যা কিছু প্রকাশের গৌরবে উজ্জ্বল, তাই সুন্দর—সেখানে জরাগ্রস্ত কাম্বারল্যান্ড ভিক্ষুকের সঙ্গে বীর ওথেলোর কোন পার্থক্য নেই, ক্ষুদ্র ডেইসি ফুল আর নক্ষত্রখচিত মহাকাশ, দুই-ই এক প্রকাশের বার্তা বহন করে ধন্য। এমনি করে প্রকাশমাত্রকেই মহৎ বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন বলে ইমপ্রেশনিস্টরা বলতে পারতেন ওর্ডসওয়র্থ-এর মতো, বলেছিলেন—শিল্পীর চোখে সুন্দর মুখ আর বাঁধাকপি দুই-ই সমান শ্রদ্ধেয়, উভয়েই শিল্পের উপজীব্য। এই যে স্বচ্ছ, সহজ মন, রূপের যে কোন প্রকাশই ছাপ রেখে যায় এমন একটি মন, এ মন অতএব নিষ্ক্রিয় নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আনন্দের যোগস্থাপনের সেই একমাত্র সূত্র।

এক-একদিন বিস্ময়ের দরজা আমাদের চোখের সামনেও খুলে যায়। সকালে সানাই শুনেই চমকে ওঠে মন—এ কি আগমনীর সুর না? হাওয়া গায়ে লাগলেই বলে উঠলাম—শীত তবে গেল, এ যে বসন্তের হাওয়া! কিন্তু চকিত আনন্দের এই মুহূর্তগুলি আমাদের জীবনে যেমন অচির-স্থায়ী, তেমনি সংখ্যায় অল্প। একমাত্র শিল্পেই এরা অমরত্ব লাভ করে। একমাত্র শিল্পীর জীবনেই আনন্দের এই সহজ উৎসটুকু অভ্যাসে জীর্ণ হয়ে যায় না। শিশুর এই সারল্য, মুগ্ধ হবার এই স্বাভাবিক প্রবণতাটুকুই লক্ষ্য করেছি অতুল বসুর চরিত্রে ও মনে। ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের সে অভিজ্ঞতা স্মৃতির অম্লান সম্পদ। নিজ শিল্পীজীবনের অতীতচারণায় কখনও সে মন অট্টহাস্যে উচ্চকিত, রেমব্র্যানট (Rembrandt) কিংবা যামিনী রায়ের মতো অগ্রজ পূর্বসূরীর প্রসঙ্গে শ্রদ্ধায় অবনত, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের গান ('কহ রে সজনী দুরুযোগে/কুঞ্জে নিরদয় কাণ/দারুণ বাঁশরি কাহে বজাওত/সকরুণ রাধা নাম') কিংবা কবিতা ('মনে যে গানের আছিল আভাস') উল্লেখে স্খলিত-বাক বিস্ময়ে অশ্রুসজল। আর সব প্রসঙ্গের মধ্য দিয়েই ঘুরে ফিরে ভাসে কত করতে পেরেছি তার হিসেব নয়. কত দেখলেম তারই তৃপ্তি। 'লাগল ভালো, মন ভুলালো,/এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই', বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বালক রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি অতুল বসুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ১৮৮১ সালে আঁকা ঐ পেন্সিল-স্কেচটিতে লক্ষ্য করি সৌন্দর্যের প্রথম দর্শনে বালক রবির বিস্ময়বিমুগ্ধ দু চোখ। সদর স্ট্রীটের মাথায় সূর্যোদয়ে একদিন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল যে কবির, দীর্ঘ আশি বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যসাধনায় এ বিস্ময় তাঁকে বারে বারে ডাক দিয়েছিল—পদ্মাতীরে সূর্যোদয়ে, প্রভাতের প্রথম জাগরণে কিংবা ফাল্গুনের মাধবীলীলায়। দূর প্রবাসে একদিন একটি লতা কবিকে ঔদাস্যের জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর সেই বিস্ময়ের আনন্দকেই তিনি ছন্দে-বাণীতে রূপ দিলেন—'নীলমণিলতা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিতে আনন্দিত বিস্ময়ের যে প্রতিরূপ, তারই সাক্ষাৎ আমরা পাই বারে বারে কবির কাব্যে, গায়কের সুরে, শিল্পীর শিল্পে। অভ্যাসের সীমা টানা, চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে ঘেরা এই পৃথিবীর মধ্যেই তাঁরা বিস্ময়ের সন্ধান পান; উদাসীনতার ম্লান কুয়াশায় আচ্ছন্ন জড়িমাজীর্ণ আমাদের দুচোখের আবরণ সরিয়ে রূপে ভরা. রঙে উজ্জ্বল পৃথিবীকে দেখতে সাহায্য করেন; কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে আমাদের নম্র মন তখন বলে, 'কেন এ কে জানে' :

কেন এ কে জানে এত বর্ণ গন্ধ রসের উচ্ছ্বাস
প্রাণের মহিমাচ্ছবি, রূপের গৌরবে পরকাশ

যেদিন বিতানচ্ছায়ে, মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'?

রূপের গৌরবে প্রকাশিত, প্রাণের এই মহিমার ঘোষণাই অতুল বসুর শিল্পসৃষ্টির মর্মবাণী।

তপন রায়চৌধুরী

সন্ন্যাসের বিলয়

সন্ন্যাসপ্রথার লোপ হবার সময় এসেছে। এখনো বহু সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সৎলোক; স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন; একথাগুলো সত্য কিন্তু অবান্তর। সন্ন্যাসীদের দ্বারা যে-সমস্ত ভালো কাজ হয়েছে তা প্রথার গুণে নয়, স্থানকালপাত্রের গুণে। সেই স্থানকাল-পাত্রের গুণ যে যুগে প্রায় সাধারণ ছিল সে যুগ ফুরিয়েছে।

প্রথাটার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ওটা মানবচরিত্রবিরুদ্ধ। মানুষ মানে তাকেই যার বল বেশি, যার অভিজ্ঞতা বেশি, যার ভাগ্য বেশি। অর্থাৎ তাকেই মানে যাকে রাজা বলে চেনা যায়। এ ছাড়া মানে বিশেষজ্ঞকে, আর সব বিশেষজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবদেবীর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে তাকে, অর্থাৎ পুরোহিতকে। রাজা বিশেষজ্ঞ নন, তিনি সর্বজ্ঞ, সবরকম বিষয়ে তাই রাজাকেই মানে বেশি, দেব-দেবীর বিষয়ে সুদ্ধ।

সন্ন্যাসীকে মানতে চায় না। কিছুদূর পর্যন্ত মানে হয়তো, প্রথাটা রয়েছে বলেই। বেশি দূর নয়। তাও তার সন্ন্যাসীকে মহারাজ সম্বোধন করা চাই, তাকে ধনদান করা চাই। সন্ন্যাসীদের উপর নির্ভর করলে সামাজিক ব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কী করে যথেষ্ট পরিমাণে হবে তাহলে? আরও কথা, ধর্মচর্চা যদি সন্ন্যাসীদের উপর নির্ভর করে তাহলে সে ধর্মে কাজ হবে কতটুকু?

কাউকে না কাউকে মানতে হয়ই। তা না হলে একা বেশি কিছু হয় না। সমষ্টিগত জ্ঞান না পেলে অজ্ঞান ঘোচে না সহজে। নিজের উপর নির্ভর করে যেটুকু জ্ঞান অর্জিত হয় তা বেশি নয়। সন্ন্যাসীদেরও দল থাকে। রাজা যেদিকে সেইদিকেই যাবার ঝোঁকটা তাই প্রবল।

কথা শুনবে না, শুধু ভান করবে কথা শোনার, অথবা কথা শুনবে অত্যল্প পরিমাণ, নামমাত্র —এই বৃত্তি তো ভালো নয়। এর উপর নির্ভর করলে কোনো বিষয়েই অজ্ঞান দূর হবে না, এমন কি দেবদেবীর বিষয়েও নয়।

সন্ন্যাসপ্রথার উৎপত্তি কেন হয়েছিল তবে—একথার জবাব প্রয়োজনীয় নয়। উৎপত্তি যে কারণেই হয়ে থাক, সমাজসংগঠনে সন্ন্যাসের দৌর্বল্য বোঝা কঠিন নয়।

সন্ন্যাস মানে ত্যাগ। ত্যাগ যদি উপযুক্ত হয় তাহলে তার থেকে বল বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, ভাগ্যও উন্নত হয়। কিন্তু সাধারণ লোককে ত্যাগের মহিমা বোঝানো শক্ত। রাজা ত্যাগী নন, ভোগী। ভোগের গুণেই বড়। ভোগীর কথাই লোকে শোনে বেশি।

সন্ন্যাসীরা খায় কম। কথাটা ঠিক, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়ও কম। কারণ লোকে নামমাত্র ছাড়া মানতে চায় না।

সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে আরো বলবার কথা আছে। সন্ন্যাসী কে, কার প্রতিনিধি? পুরোহিত যেমন

রাজশক্তির উপর নির্ভর, সন্ন্যাসী কি তাই?

প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের শেষের দিকে যখন সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করা হয় তখন এ প্রশ্নের উত্তর ছিল পরিষ্কার। সন্ন্যাসীও রাজশক্তির উপর নির্ভর—কিন্তু নিকটস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের নয় দূরস্থ সমগ্র হিন্দুরাজাদের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরই উপর নির্ভর। সন্ন্যাসী দেবদেবী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতেও পারে নাও পারে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নয়। যৌগিক কতগুলি ক্রিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে চিকিৎসক-তুল্য বিবেচিত হতে পারে। নয়তো সন্ন্যাসীকে বিবিধ কর্ম করতে হয়, রাজশক্তির প্রতিনিধি বটে কিন্তু বিশেষজ্ঞ নয়। ছেলেভুলোনো ম্যাজিক, বালকের শিক্ষা, দুর্গতের ত্রাণ, রোগীর হাসপাতাল ইত্যাদি অনেক কিছুই।

এ কাজগুলি নিকটস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের দায়িত্ব—অন্তত আজকালকার মতে। শেষোক্ত বিবিধ কর্মগুলি তো বটেই। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ক্রমশই এ বিষয়ে আরও সচেতন হয়ে উঠছেন। তাঁদের কাজ তাঁরা যতই হাতে নেবেন সন্ন্যাসের প্রয়োজন ততই ফুরোবে।

হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের স্থান ক্যাথলিক ধর্মে সন্ন্যাসের স্থানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ক্যাথলিক ধর্মে দেবদেবীর পূজা নেই, সন্তপূজা আছে। সন্তদের বেশির ভাগই সন্ন্যাসী চরিত্র। তা ছাড়া ক্যাথলিক ধর্মে সন্ন্যাসী পুরোহিত আলাদা নয়। সাধারণভাবে তাই হিন্দুদের পক্ষে সন্ন্যাসের লোপ অপেক্ষাকৃত সহজও বটে, একেবারেই সম্ভবও বটে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তুলনা আরও অবান্তরীয়। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অনেকদিন হল বিলুপ্ত হয়েছে। হিন্দু সন্ন্যাস বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মতো নয়। বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাও এ স্থানে ঠিক হবে না।

পুণ্যশ্লোক রায়

চতুর্থ অঙ্কের প্রতীক্ষায়

নাটকের তিন অঙ্ক দেখা হয়ে গেছে। চতুর্থ অঙ্কের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি।

প্রথম অঙ্কে শুনেছি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, লক্ষ্মীর পাঁচালী। যাত্রায় আর পালাগানে প্রথম অঙ্কের দর্শকরা অবাক হয়ে দেখত পৌরাণিক আদর্শ, কবির লড়াই তর্জাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলোও বিনা প্রয়াসে আয়ত্ত করত। প্রত্যেক বাড়িতে সন্ধ্যায় ধুনো গঙ্গাজল, ছোটদের নিয়ে ঠাকুরমা'রা বলতেন রূপকথা—আরামের পালঙ্ক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বীর রাজপুত্রদের দুঃসাহসিক জয়যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী। বাবা-কাকারা একান্তবর্তী অনটনের সংসারে সকলের সমান খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করছেন প্রাণপাত চেষ্টায় অথচ হাসিমুখে শিক্ষকরা আধপেটা খেয়েও রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠিরের আদর্শ প্রচার করতেন ছাত্রমহলে। বিদেশী শাসক সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে, সর্বস্তরেই শান্তি স্থাপন করেছে; উপার্জনের নব নব কর্মকাণ্ড দিকে দিকে প্রসারিত। যুবকরা ধনী হবার নতুন প্রেরণায় দেশবিদেশে বেরিয়ে পড়ছে। সাফল্যের অসংখ্য ধারায় প্রাচুর্যের বন্যা। তৈরি হচ্ছে ছোট-বড় ধনী, ব্যবসাদার, জমিদার। তাদের দানে গড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা, সাঁকো, মন্দির, অতিথিশালা। গরিবের ঘর থেকেও মাথা তুলে বেরিয়ে আসছে এমন সব জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, মনীষীর দল যাঁদের জন্মের শ্বিশত-বার্ষিকী, সার্ধশতবার্ষিকী এখন আমরা পালন করছি নাচ-গান আর বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়ে। এর

পরেই হয়েছিল প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠল। লক্ষ্ণৌর পাঁচালীর জেল্লা আর তেমন নেই, কবিগান প্রায় অচল। তার জায়গা দখল করেছে 'জনা' থেকে শুরু করে 'মেবার পতন'। যার মূল শিক্ষা 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'। সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'। রামায়ণ থাকলেও সেই কৃত্তিবাসী নেই, তৎপরিবর্তে 'গাহি মা বীররসে ভাসি', মেঘনাদবধকাব্য। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সুর এক ও অদ্বিতীয়—'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়'। অন্দরমহলে ধুনো গঙ্গাজল আগের মতোই। ঠাকুরমা রূপকথা বললেও ছেলে মায়ের কাছে রান্নাঘরে বসে শুনতে চায় বিবেকানন্দের গল্প যা কিনা তার অল্পশিক্ষিত মা সেই সন্তাহের 'হিতবাদী' বা 'বঙ্গবাসী' কাগজে সেই দিনেই বা তার দু-একদিন আগেই মধ্যাহ্নের অবসরে পাঠ করেছেন। অপরপক্ষে বেশির ভাগ একান্নবর্তী পরিবারেই ভেদবুদ্ধির অল্প অল্প কালো রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। কোন কোন বেশি মাইনের করিৎকর্মা লোকের মনের অন্ধকার কোণে সরলবিশ্বাসী নিকটতম আত্মীয়কে বঞ্চনা করার কুটিল স্বার্থবুদ্ধি দানা বাঁধতে আরম্ভ হয়েছে। ওঁদিকে শিক্ষকরাও বহুপঠিত পুরাণকাহিনীর পরিবর্তে ম্যাট্‌সুইনি, গ্যারিবল্‌ডির আদর্শে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করছেন, দরিদ্রসন্তান নেপোলিয়নের কীর্তিকাহিনীতে তৎকালীন তরুণ-সমাজকে মুগ্ধ করছেন। বিদেশী শাসক তার বন্ধনকে কঠিনতর করছে। উপার্জনের কর্মপরিধি ক্রমশ সীমিত হচ্ছে। সাগরপারের বিদেশী শোষক আর ভারতের ভিন্নভাষী অর্থসর্বস্ব বৈশ্যবংশ বাংলার ভাঁড়ারঘরে জবরদখল প্রতিষ্ঠা করছে। মন্দগুপ্তির অন্তরালে অতি ধীরে প্রায় অজ্ঞাতেই বিদেশী শাসকদের তাড়াবার জন্য গড়ে উঠেছে আত্মানুতির সংকল্পে অবিচলিত 'সন্তানদল, গড়ছে মহারাষ্ট্রে, বাঙলায়, পাঞ্জাবে এবং সাগরপারেও। ভবানী পাঠক, সত্যানন্দের মানসপুত্রেরা তৈরি হতেই গর্জে উঠল বোমা, পিস্তল, রাইফেল। বিদেশী পুলিসও তৎপর হল হাতকড়ি নিয়ে যার পরিণতি দ্বীপান্তর আর ফাঁসির দড়িতে। এইভাবেই আসমুদ্রহিমাচল কাঁপিয়েছিলেন যাঁরা, আমরা আজ সেইসব মনীষী এবং কর্মীদের জন্মশতবার্ষিকী পালন করি। আধুনিক বাঙলার অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী দ্বিতীয় অঙ্কের এখানেই যবনিকাপাত।

তৃতীয় অঙ্কে একজন দুজন নয়, বিস্তর নেতা, জনদরদী, সাহিত্যিক দল বেঁধে এবং দলাদলি করি এগিয়ে আসছেন অসংখ্য, ভিড়ে ভিড়াক্কার, কিন্তু একালের রাজনীতি, জনসেবা, সাহিত্য—কোন কিছুরই বীজ এদেশের নয়, সমস্তই বিদেশী। সাহিত্যে 'গাহি মা বীররসে ভাসি' নয়, আদি রসের অফুরন্ত স্লাবন। ছবিতে গানে তারই উদ্দামতা। দেশীয় ভাবধারার পুরাতন যাত্রা থিয়েটার একেবারে অচল, তার জায়গায় নানা ঢঙের নতুন আঙ্গিকের অভিনয়, যেখানে পুরাতন আদর্শবাদ ঘৃণিত, বর্তমান পরিবেশের দোহাই দিয়ে শ্রেণীবিরোধ ও পারস্পরিক ঈর্ষার প্রবল প্রেরণা এর একদিকে এবং অন্যদিকে বাস্তববাদের অজুহাতে যথেচ্ছ বাভিচার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুখোশ পরিয়ে স্বার্থসর্বস্বের অবাধ অত্যাচার। ভেঙে পড়েছে একান্নবর্তিতা। এক ভাইয়ের ঘরে খাদ্যপানীয়ের অফুরন্ত স্রোত, বিলাসের যাবতীয় উপকরণ; অন্য ভাই অন্নাভাবে দিশাহারা। এখনকার ঠাকুরমা'রা রূপকথা বলবেন কি, জানেনই না, রূপকথার জন্যে চেয়ে থাকেন 'মিকি মাউসে'র দিকে এবং মায়েদের সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধ নামমাত্র। ধনী মা সন্ধ্যায় পার্টিতে যান, গরিব জননী পরের বাড়ি টিউশনি করেন। ছেলেরা সন্ধ্যায় বেওয়ারিশ রোয়াকে, পার্কের বেঞ্চিতে আর পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, মধ্যবিত্তরা শোনে রেডিও যেখানে লোকসংখ্যা সীমিত করার প্রচণ্ড আগ্রহে জন্মনিয়ন্ত্রণের অশ্রাব্য উপদেশ। ধনিগৃহে সন্ধ্যায় পঠনপাঠনের প্রবেশ নিষেধ, কারণ সেখানে তখন টেলিভিশনের ভীষণ প্রতাপ। শিক্ষকরাও শিক্ষকতা ত্যাগ করে শিক্ষাজীবীর বৃত্তিটুকুই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

তাদের কাছে শিক্ষালয়ের দ্বারা প্রদত্ত মাসমাইনেটা এখন কেবলমাত্র রিটেনিং ফী। তাঁদের আসল উপায় টিউশনি আর কোচিং ক্লাস, যে উপার্জন ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা টেরও পায় না। দ্বিতীয় উপায় মানের বই লেখা। সেই লেখাতেও পুস্তক-প্রকাশকদের সঙ্গে নানা রকমের আলো-আঁধারি, লুকোচুরি, মাৎস্যন্যায়। এর উপর শিক্ষকদের আর-একটা বড় কাজ,—বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বছরে দু-চারবার ধর্মঘট, মিছিল, রাজভবনের ফটকে লোক-দেখানো প্রায়োপবেশন।

তৃতীয় অঙ্কের আদর্শহীন, দাম্ভিক মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের শতসহস্র চাহিদা দ্রুতবেগে বর্ধমান। বিলাসিতার অজস্র উপকরণ, ব্যক্তিস্বার্থের লক্ষ রকম দাবি—এই-সমস্তের জন্যই চাই তার টাকা, আরও টাকা এবং অনেক টাকা। চাহিদাবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি, মজুরিবৃদ্ধি এবং তারই পরিণামে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির দুষ্টচক্রে মানুষ আজ নিজের সৃষ্ট রাক্ষসী ক্ষুধায় নিজেই বিপর্যস্ত। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, আন্তরিকতা—প্রথম আর দ্বিতীয় অঙ্কের এইসব মানবিক বৃত্তি তৃতীয় অঙ্কে 'কবিত্ব',—উপহাসের বস্তু; তৃতীয় অঙ্কের কৃতী লোকেরা এইসব ভাবধারাকে মনে মনে বর্জনীয় কুসংস্কাররূপেই গ্রহণ করেন। তৃতীয় অঙ্কের নায়ক-নায়িকার চোখে সংসার আর আশ্রম নয়, সংসার বিলাসের নর্মকুঞ্জ, খেয়ালখুশির চরিতার্থ করার নিজস্ব আড্ডাখানা। সেই বিলাসের জন্য অসবর্ণ বিবাহ এবং বিলাস ক্ষুণ্ণ হলেই বিবাহবিচ্ছেদ। দুয়ের জন্যই সরকারী আইন আর ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন। ভ্রূণহত্যায় সরকারী আইনের অবাধ প্রশ্রয়, সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের ব্যাপক ব্যবস্থায় সাগ্রহ আমন্ত্রণ; সমাজের উদার স্বীকৃতি। এইভাবে কৃষ্টির ভূমিকায় 'খিস্তি'র এবং সংস্কৃতির মুখোশে দুষ্কৃতির অবাধ অভিযান এখন পর্যন্ত পূর্ণবেগে প্রধাবিত।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত একদিন-না-একদিন হবেই। কিন্তু আজ থেকে একশ বছর পরে যারা আসবে তারা অর্থাৎ আমাদের সেই অনাগত বংশধরেরা কি জন্মশতবার্ষিকী পালনের মতো এখনকার আমাদের মধ্যের একটা নামও খুঁজে বার করতে পারবে? আমরা তো আমাদের চারপাশে চেয়ে-চেয়ে এরকম একজনকেও খুঁজে পাই না যাকে মনে রাখতে ইচ্ছে হয়। শুধু বাঙলায় নয়, সারা ভারতেই বা কে এমন আছে আজ থেকে শতবর্ষ পরে যিনি হবেন শ্রদ্ধায় কীর্তিতে বরণীয় আর স্মরণীয়?

এ রকম কেউ থাক আর নাই থাক, তৃতীয় অঙ্কের নিদারুণ রিক্ততা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কুশীলবরা পূরণ করবে—এই আশাই আমাদের এখনকার প্রেক্ষাগৃহের একমাত্র সম্বল। অবচেতন ক্ষীণ একটা আশাই বার বার উঁকি দেয়। আমাদের বাল্যকালের অর্থাহারী শিক্ষকমহাশয় বলতেন, 'ওরে, গরিবের ছেলেরাই বড়ো হয়, বড়লোকের ছেলেরা পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে অধঃপাতে যায়'। গুরুবাক্যের দ্বিতীয় অংশ চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অসংখ্য ক্ষণজন্মাদের বংশধরদের অধঃপাতযাত্রার বিরাট মিছিল প্রত্যক্ষই দেখছি। অতঃপর সেই পরাধীন দরিদ্র যুগের অখ্যাত শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করে প্রার্থনা করি—এই অনর্থপাতী অর্থপ্রাচুর্যে গর্বিত বর্তমানের ধনী-অকিঞ্চনদের অনাগত ছেলেরা যেন আবার বড় হতে পারে, মানুষ হতে পারে, সভ্যজগতে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে।

চতুর্থ অঙ্কের এই দৃশ্য যে কবে দেখব তা উইংসের অন্তরাল থেকে যে অদৃশ্য নিয়ন্তা এই বিশ্বাভিনয় পরিচালন করছেন একমাত্র তিনি বলতে পারেন। দৈবনামক সেই অজ্ঞাত প্রম্পটারের মর্জির অপেক্ষায় প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান দর্শকরা আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে।

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার স্তর

ইংরেজ কবি রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌ মনে করেন অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার আগে ভাষার স্তর ঠিক করা উচিত। মূল রচনায় ভাষার স্তর দেখে নিয়ে লক্ষ্য ভাষা বা গ্রাহী ভাষায় তার সংগত সমকক্ষ স্তর মনোনীত করা অনুবাদকের প্রথম কর্তব্য।

ভাষার স্তর বলতে কী বোঝায়? ভাষার মধ্যে উচ্চতা বা অনুচ্চতা আছে? সেই উচ্চতা বা অনুচ্চতার সঙ্গে কি শ্রেণীর মিল আছে? সামাজিক শ্রেণীর?

ভাষার ধরনধারনে সামাজিক শ্রেণী ধরা তো পড়েই। শিক্ষার বিস্তৃতিও ধরা পড়ে। একজন জেলেনীর কথার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানীর কথা কি মেলে? অথচ দুজনই একই ভাষা বলে থাকতে পারে। একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেক রকম। শ্রেণী, শিক্ষা, বৃত্তি, অবস্থা—সবই প্রকাশ পায় ভাষায়। কী রকম ভাষায়?

ইউরোপে এককালে গ্রীক আর লাতিন ভাষায় কবিতা দক্ষতার সঙ্গে লেখা হত। ভারতে এখনও সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে লেখা হয়। গ্রীক বা লাতিন ছিল না কবিদের মাতৃভাষা। সংস্কৃত বা ইংরেজী ভারতীয় কবিদের মাতৃভাষা নয়। গ্রীক আর লাতিন ইউরোপে যেমন পড়া হত, ভারতে সংস্কৃত আর ইংরেজী পড়া হয়। সংস্কৃত লাতিনের মতন দেবভাষা। অন্য তিনটি ক্ল্যাসিক ভাষা থেকে ইংরেজী কিন্তু একটা বিশেষ কারণে স্বতন্ত্র। ক্ল্যাসিক ভাষার মর্যাদা পেলেও ইংরেজী জীবন্ত ভাষা। ক্ল্যাসিক ভাষা দাতা ভাষা। দেয় যত, তত নেয় না। জীবন্ত ভাষা গ্রাহী ভাষা। যেমন দেয় তেমনি নেয়। তার গ্রহণ করার ক্ষমতা তার বৈশিষ্ট্য। বহু ভাষার মূল রচনা নিত্য তার ভাণ্ডারে তুলে রাখা হচ্ছে। সব শ্রেণীর লোকের রচনা গ্রহণ করে। সব শ্রেণীর লোক এই সম্পদের সুযোগ সুবিধা পায়। ক্ল্যাসিক ভাষা রক্ষণশীল। জীবন্ত ভাষা প্রগতিশীল।

মানবজীবনের সব দিক ভাষায় প্রকাশ পায়—শারীরিক, মানসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধার্মিক, বৈষয়িক, সাহিত্যিক—চিন্তাশীল ও আবেগশীল। অভিজ্ঞতার বিস্তার এবং ভাষার বিস্তার একই। এই কারণে কাট্‌স্‌ ভাষাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন অভিজ্ঞতা অনুসারে। এই ভাগগুলিকে স্তর বলা হচ্ছে এই প্রবন্ধে। এদের মধ্যে উচ্চতা বা অনুচ্চতা নেই। শ্রেণীর পরিচয় নেই। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপ প্রকাশভঙ্গির বর্ণনা করা হয়েছে—এই পর্যন্ত। তবে এই ধরনের বিশ্লেষণে অনুবাদকের অনেক সাহায্য হয়।

ভাষাস্তর

০— আবেগশীল ভাব ও বোধ
মানসিক আন্দোলন
মনোভাব
আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, বিস্ময়, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি
যেমন—অঃ উঃ হেঃ ধেৎ ধুৎ ছি ছ্যা-ছ্যা
—১ অবচেতন মনের ভাষা
১ দৈনন্দিন ভাষা, সাধারণ যুক্তিবাদ,
বৈষয়িক ভাষা, ব্যবহারিক ভাষা
১+ স্বাভাবিক ভাষা
এর মধ্যে —১, ১ এবং ০ স্তর অন্তর্ভুক্ত

—২ স্বপ্নের ভাষা, কখন কখন দেববাণীর ভাষা,
ভবিষ্যৎ বাণীর ভাষা
২ বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় চিন্তার সূত্রপাত
দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত
সংস্কৃতির আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করা এবং বিভিন্নতা দেখা
বিভিন্ন আচারের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ
সামাজিক সংস্কৃতির প্রকাশ
নৃতত্ত্বের সূত্রপাত
২+ বৈজ্ঞানিক বিদ্যার ভাষা। এই ভাষা দু প্রকার হয় :
(ক) তত্ত্বের বিদ্যা
(খ) ব্যবহারিক বিদ্যা
৩ বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংস্কৃতি
সংবাদ বা বার্তা হিসাবে মানবজীবনের সব অভিজ্ঞতা গুছিয়ে প্রকাশ করা হয়
এই অর্থে অন্য সব রকম সংস্কৃতি থেকে আলাদা
৪ ধর্ম ও দর্শনের ভাষা
৫ অঙ্কের ভাষা
যা কিছু সম্ভব অঙ্ক তার ভাষা
৬ দর্শনের উচ্চতম মনোভাবের প্রকাশ
যতরকম সমাজ বা সংসার জগতে সম্ভব তাদেরই ভাষা।

খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটা মূল রচনা আগাগোড়া ভাষার একটিমাত্র স্তরে আবদ্ধ থাকে। অনতিদীর্ঘ কবিতার বেলা সম্ভব হয়তো হতেও পারে, তবে সাধারণত হয় না। বিভিন্ন স্তরে যাওয়া-আসা কিন্তু বাধাহীন। অবলীলাক্রমে হয়। ভাষার স্তর সজ্ঞানে বদলানো যায় কোনো বিশেষ প্রয়োজনে। না ভেবেচিন্তেও ভাষার স্তর বদলে যেতে পারে কোনো এক আবেগশীল ভাবের চাপে। অনিচ্ছাকৃত হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, ভাষার ছয়টি স্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো সহজ। এই ঘুরে-বেড়ানোর পথ অনুসরণ করে অনুবাদক তার একটি প্রতিরূপ বা মুদ্রারূপ তৈরি করে। এই প্রতিরূপ বা মুদ্রারূপ অনুসারে অনুলিপি বানানো হয়। তার পরে গ্রাহী ভাষায় স্থানান্তর করে অনুবাদক। এইভাবে স্থানান্তর যদি না করা হয় মূল রচনা বিকৃতভাবে নতুন ভাষায় আসবে। তার রূপ বিকৃত হলে মানেও বিকৃত হবে। অনুবাদ ঠিক হবে না। গ্রাহী বা নতুন ভাষায় মূল রচনা সুচারুভাবে আনা সম্ভব হবে না।

লেখার রীতি

ভাষান্তরের প্রতিরূপ বা মুদ্রারূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে মূল রচনার লেখার রীতি বা স্টাইল। কার উদ্দেশে কে কী বলছে দেখে লেখার রীতি নির্ধারিত হয়। যে শোনে সে কে? যে শোনায় সে কে? যে শোনে এবং যে শোনায় তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কী? তারা কি ক্রেতা আর বিক্রেতা? মাতা-পুত্র? ভাইবোন? চোর আর পুলিস? সমবয়সী স্কুলের সঙ্গী? গুরুজন আর ছাত্র? স্বামী-স্ত্রী? সম্পর্ক যেমন রীতি তেমন। নানাভাবে প্রকাশ পাবে—অনুকম্পা, মঙ্গলেচ্ছা, ঘৃণা, রাগ, উপহাস, অবজ্ঞা, ত্রাস, উত্তেজনা, হতবুদ্ধি ভাব, অনুনয়, অন্তরঙ্গতা, বিহ্বল ভাব, অপ্রতিভ ভাব, ব্যাখ্যাকারী ভাব, মন্ত্রণা বা উপদেশক ভাব, প্রণালীসংগত ভাব, আজ্ঞা, তিরস্কার,

ভর্ৎসনা ইত্যাদি। এক-এক রীতিতে এক-একটা ভাব প্রকাশ করা হয় এক-একটা সম্পর্কের সঙ্গে মিল দেখে। সবরীতি সব সম্পর্ক উপযুক্ত হয় না। সম্পর্কের সঙ্গে রীতির মিল যদি না থাকে বাক্য হাস্যকর হয়। কখন কখন লেখক মূল রচনায় ইচ্ছা করে এই রকম অমিল রাখে না তা নয়। রাখে। অনুবাদক যখন দেখে এই ধরনের অমিল রয়েছে তাকে চিন্তা করতে হয় কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসের প্রকাশে এই রকম বেখাপ্পা রীতি ব্যবহার হয়। অনুবাদককে গ্রাহী ভাষায় সমতুল্য রীতি খুঁজতে হয়। একই রচনায় যেমন একাধিক ভাষান্তর থাকতে পারে, বিভিন্ন রীতিও দেখা দিতে পারে। রীতিপরিবর্তনের সমতুল্য মুদ্রারূপ অনুসারে মূল রচনা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা হয়।

একই ভাষান্তরে যেমন কোনো রচনা আবদ্ধ থাকে না তেমনি একই রীতিতেও আগাগোড়া কোনো রচনা লেখা হয় না। অবস্থা, সম্পর্ক আর পরিবেশের সঙ্গে রীতি বদলায়। সমতুল্য রীতি খুঁজে দরকার মতো অনুবাদক সেটাকে পাল্টাতে থাকে।

স্থানান্তর

ইংরেজ কবি গ্রেভ্‌সের বক্তব্য শব্দচয়ন সম্বন্ধে। শব্দাভিত্তিক অনুবাদ হত মধ্যযুগে। শব্দের সমতুল্য শব্দ খোঁজ করা হত। অনুবাদের কাজ আজকাল শব্দকে অবহেলা করে না, তবে শব্দসমষ্টি, বাক্য, কথনের ধারা, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় এবং সমগ্র রচনার গুরুত্ব ও মানে। সমগ্র রচনার সীমারেখা গ্রাহী ভাষায় অটুট রাখতে হয়। এই সীমারেখা বিকৃত না করে মূল রচনার প্রত্যেকটি অংশ যার যার স্থানে আর মাপে ত্রুটিহীনভাবে বসাতে হয়। ভাঙলে চলবে না। একটা বাগান থেকে অন্য বাগানে গাছ তুলে লাগানো যায়। বড় বড় গাছও বাগানান্তর করা সম্ভব। তবে গাছ যদি মরে যায় কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে। কাজটা ঠিকভাবে করা হয়নি। অপটুতার দরুন জীবন্ত একটা বাণী পথে নষ্ট হয়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝির ফলে মানবসংসারে যত গোলমাল। মানুষের প্রাণ যায় মান যায় সবকিছু যায়। ব্যোমারোহণের যন্ত্রনির্মাতার মতো যথার্থতা এবং সুনির্দিষ্টতা না থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতি অধিক হতে বাধ্য।

লীলা রায়

পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যসাধনা

আমরা অনেক ভালো জিনিস হারাতে বসেছি। ফাঁকা জায়গা কমছে, গাছপালা কমছে, তেমনি কমছে ভালো লেখক। ভালো লেখক মানে তো এ নয় কার কতো বই হৈ হৈ করে কাটলো, কার পাবলিশার শাঁসাল, দু-কলমব্যাপী কার বইয়ের রিভিউ বেরোল, বা প্রাইজ পেল কি পেল না। আমাদের যতটুকু সাহিত্যবুদ্ধি তাতে ভালো লেখক মানে যিনি চারপাশের জগতের দিকে চেয়ে আছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নিজের অন্তরের দিকেও অতন্দ্র দৃষ্টি, যিনি বাহির ও ভেতরের মাঝখানে সেতুবন্ধনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কখনও সফল হয়েছেন কখনও হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ইয়োরোপীয় উপন্যাসচর্চা আমাদের মনের দিগন্ত আলো করে রেখেছে, যেখানে এলিফেন্টার ত্রিমূর্তির মতো বালজাক-স্তাঁদাল-তলস্তয় দাঁড়িয়ে আছেন এবং সীমিত হলেও যেখানে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তিও ভাস্বর সেখানে পাঠক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা কমাতে আমরা নারাজ। এবং

এই ভালো সীরিয়াস উপন্যাসের ধারা অক্ষুন্ন রাখার যে অম্লান চেষ্টা অন্নদাশঙ্কর করেছেন পঞ্চাশ বছর ধরে, সেজন্যে আমরা তাঁর কাছে পাঠক ও লেখক হিসেবে কৃতজ্ঞ।

বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা যে সব সময় সফল হয়েছে তা নয়। তাঁর দীর্ঘ 'সত্যাসত্য' অথবা পরবর্তীকালে 'রত্ন ও শ্রীমতী'র যেমন আইডিয়া অনেক ক্ষেত্রেই চমৎকার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি কখনও তা রক্তমাংসের সজীবতা লাভে কিছুটা বা অসম্পূর্ণ। কিন্তু যে কথাটা অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে না বললে কোনো কথাই বলা হয় না তা হল, তিনি প্রায় সর্বদাই সজাগভাবে চেষ্টা করে গেছেন অন্তর ও বাহিরকে মেলাতে। তুর্গেনিভ যে অর্থে হ্যামলেটের চেয়েও ডন কুইক্সোটকে অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও মহত্ত্বে উদ্ভাসিত মনে করেছেন সেই অর্থেই প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে এই নিরলস ডন কুইক্সোট অন্নদাশঙ্করকে সেলাম।

আমাদের দেশে যখনই দুর্দিন এসেছে, দেশভাগ, ভারত-চীন সংঘর্ষ অথবা সংবিধান সংশোধনের জন্যে ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রায় উন্মত্ত তখন স্পষ্ট নির্ভীক অন্নদাশঙ্করের গলার আওয়াজ আমরা বারে বারে শুনেছি, কখনও তা মর্মভেদী ছড়ায় কখনও বা প্রবন্ধে। কোনো দলের দিকে বা কোনো গোষ্ঠীর দিকে চেয়ে তিনি কথা বলেননি। হিন্দু-মুসলমান কিংবা পাকিস্তান-বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কেও অগ্রজ লেখকদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে সজাগ দৃষ্টি অন্নদাশঙ্করের। তাঁকে বার বার সেলাম।

অসীম রায়

বিষ্ণুকৃষ্ণ-কথা
(সংশোধন)

মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩ সংখ্যা চতুরঙ্গে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে কিছু ছাপায় ভুল আর লেখায় অমনস্কতা আছে। সেগুলি সংশোধন না করলে প্রবন্ধটি হয়ত সর্বাংশ ঠিক বোঝা যাবে না। তাই করছি। শুদ্ধ পাঠ নিম্নরূপ :

পৃষ্ঠা ২৭৯ পংক্তি ১৯ "তিন হাজার বার চীৎকার (বা লড়াই) করেছিলেন।"
পৃষ্ঠা ২৮০ পংক্তি ৫ "বিষ্ণুপদে"
পংক্তি ৮ "ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ"
পংক্তি ১১ "ছিলেন না।"
পংক্তি ১৩ "আরও" বর্জনীয়
পংক্তি ১৫ "অপোর্ণুতে"
পংক্তি ১৯ "ন পরাজয়েথে"
পংক্তি ২৪ "লড়াই (বা চীৎকার)"
পংক্তি ৩০ "দিবো নপাতা"
পংক্তি ৩৫ "বৃদ্ধ চ্যবনকে"
পৃষ্ঠা ২৮১ পংক্তি ১৫ "তা মাঝে মাঝে প্রকাশ"
পংক্তি ২৯ "প্রধান অঙ্গ—স্তব"
পংক্তি ৩৪ "এ সবই জমে উঠেছিল"

পৃষ্ঠা ২৮২ পংক্তি ১ "ধর্ম-ভাবনা যথাসম্ভব সরাসরি"
পংক্তি ৪ "কিন্তু আভিজাত্যের জন্যে"
পংক্তি ৫ "ধর্মব্যাপারে মোটামুটি"
পংক্তি ১০ "ঋগ্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধানতম"
পংক্তি ১১ "মধু, ঘি, দুধ..."
পংক্তি ১৪ "যেন ঘরের ছেলে"
পংক্তি ৩৩ "আলোচনায় স্বতন্ত্রতা।"
পংক্তি ৩৫ "ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে নিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিকের উচিত নয়।"

পৃষ্ঠা ২৮৩ পংক্তি ৩ "জমাট বাঁধতে শুরু"
পংক্তি ১৯ "এক কৃষ্ণ'
পংক্তি ২৩ "ঈয়ানঃ কৃষ্ণো'
পংক্তি ২৫ "সৈনহিতীর"
পংক্তি ২৭ "সাহায্য পেয়ে বীরের প্রবৃত্তি বশে"
পংক্তি ৩১ "অবতস্থিবাংসম্"
পংক্তি ৩৩ "কালো মেঘের মতো রয়েছে"

পৃষ্ঠা ২৮৪ পংক্তি ৩০ "আর 'পুরাণ'-গ্রন্থগুলির আগে"
পংক্তি ৩৬ "বলদেবের অর্জুন নামটি"

পৃষ্ঠা ২৮৫ পংক্তি ৬ "সংকর্ষণের বিশিষ্ট অস্ত্র"
পংক্তি ১০ "যথাক্রমে *wesu (দীর্ঘ এ-কার) ও *wesu (হ্রস্ব এ-কার);"
পংক্তি ১৪ "দেবতারূপে পূজিত"
পংক্তি ১৮ "নানাঘাট"
পংক্তি ৩০ "'মাধব' নামটি।"
পংক্তি ৩৭ "ধাতুতে যথাক্রমে"

পৃষ্ঠা ২৮৬ পংক্তি ১ "এবং ভজ্ ধাতুতে"
পংক্তি ৫ "co-sharer, shareholder"
পংক্তি ৬ "বা party mark।"
পংক্তি ১৫ "ভগ শব্দটি প্রচলিত ছিল"
পংক্তি ১৮ "এই শ্লোকটি (৭.৪১.৫ কখ)"
পংক্তি ৩৬ "দুটি পৃথক্ দেবভাবনা"

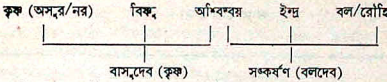

পৃষ্ঠা ২৮৭ পংক্তি ১ "নামটি অর্থ কোন কোন"
পংক্তি ৪ "সদ্ ধাতুর"
পংক্তি ২৩ "ঋতুসংবৎসর"
পংক্তি ২৬ "অর্থাৎ সূর্য (কালচক্র)।"
পংক্তি ৩১ "অহুরমজ্দার"
পংক্তি ৩১ "অথবা অপর কোন খ্রীষ্টপূর্ব"
পংক্তি ৩৫-৩৭ নক্শাটি যেমন হবে পরপৃষ্ঠায় দেখানো হল

পৃষ্ঠা ২৮৮ পংক্তি ৩ "জানি বা পাই"
পংক্তি ১৩ "শাসনে বিষ্ণু-উপাসক বোঝাতে পরম ভাগবতের স্থানে"
পংক্তি ১৪ "'মাহেশ্বর' (= শিব-উপাসক) স্থানে"
পংক্তি ২৫ "যজ্ঞ করবেন কোথায়।"
পংক্তি ২৬ "ভূমি মেপে নেবার জন্যে বিষ্ণু মাটিতে"
পংক্তি ২৭ "সব দিকে হু হু করে"
পংক্তি ৩০ "সৃষ্টি করেছে।"

পৃষ্ঠা ২৮৯ পংক্তি ৮ "মানে "বেচারা"।)"
পাদটীকা ৪ "দেবভাবনার ও স্পষ্টমূর্তি অবতারভাবনার মধ্যে"
পাদটীকা ৫ "(২.১২.১২)।"

সুকুমার সেন

স মা লো চ না

Eyeless in the Urn *By* Sanjib Datza. Lalan Prakashani, Bangladesh. Ten Taka only.

সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনা-উপলক্ষে কাব্য-রচনার রেওয়াজ প্রায়-অন্তর্মিত। অবিশ্যি রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত দলাদলি, মৃত্যু, বিবাহ, উৎসব, বন্ধুবিয়োগ বা এইজাতীয় জের এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পূর্বোক্ত ধারা ঈষৎ চালু ছিল। চতুর্থ দশকে তেমন প্রবণতা অন্তর্হিত, এমন কি আধুনিক কবি-সমীপে অবজ্ঞেয়।

যখন সংবাদপড় ছিল না, তখনও কবি ছিল। সমকুদারের সঙ্গে তাদের স্থানিক দূরত্বও তেমন ছিল না। শুধু স্থানিক দূরত্ব নয়, সেন্সিবিলিটিজ বা সংবেদনের ওলটপালটে কালের পট পুরাতন রেওয়াজ মুছে দিয়েছে। সে-কাহিনী আপাতত মুলতুবী থাক।

তবু ব্যতিক্রম আজও দেখা যায়। মহৎ কবি পর্যন্ত সাবেক রেওয়াজের শিকার হয়ে পড়েন। টি এস এলিয়টের "ফোর কোয়ার্টেট্স" এ-যুগের একটি উজ্জ্বল কাব্য-নিদর্শন। বাল্য-কৈশোরের পটভূমি এই কাব্য-রচনার প্রেরণা-উৎস। কিন্তু উপলক্ষ এলিয়টের সৃষ্টিশক্তির কোন ক্ষতি করেনি। মানুষের জীবনে কাল এবং মহাকালের সম্পর্কে কৌতূহলী কবি, আর যা-ই হোক না কেন, কিছু অতুলনীয় রূপকল্প সৃষ্টি করে গেছেন। মানুষ এবং তস্য আবেষ্টনীর জটিল আবর্তের প্রশ্ন যে-কোন চিন্তানায়কের মতো মহৎ কবির পক্ষে এড়ানো অসম্ভব।

শ্রীসঞ্জীব-বিরচিত গ্রন্থের আলোচনায় পূর্বোক্ত মুখপাতটুকু প্রয়োজন ছিল। কারণ "আইলেস ইন দি আর্ন" উপলক্ষপ্রসূত কাব্য।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দুইপারের বাঙালী-হৃদয় উন্মথিত করেছিল মর্মন্তুদ পটভূমির জন্যে। তখন ইসলামী জিগির-গর্জিত পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারের নিকট নাৎসী-বর্বরতা পর্যন্ত ম্লান। এমন চণ্ড-নীতির তোড়েই ভেসে গিয়েছিলেন কুমিল্লা শহরের অধিবাসী আজীবন দেশব্রতী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন। বাংলাদেশ কেন, উভয় বঙ্গেই নায়কের মতো স্মরণীয় ওই নাম। অবিভক্ত বঙ্গে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের ডেপুটি-লীডার। ১৯৪৮ সনে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র-পরিষদে শহীদ ধীরেন দত্তই প্রথম বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবি করেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সদা-কেল্লাফতে মুসলিম লীগের দাবুড়ি-দবদবা তখন গর্মাগরম। জনমনে তার রেশ টগবগ ফুটন্ত। অনেকে সেই সময় ভেবেছিলেন শহীদ ধীরেন দত্ত করাচী থেকে ঢাকা-বিমানবন্দরে নামামাত্র খুন হয়ে যাবেন। অকুতোভয়তার নজির শহীদের জীবনে এমন একটি নয়। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ ধীরেন দত্ত সেই নিশানের সম্মানরক্ষার্থে ঠায় রয়ে গেলেন নিজগৃহে। প্রাণরক্ষা করতে পারতেন অতি সহজে। পঁচাশি বছর বয়সে যুগল চরণ কম মজবুত ছিল না। কিন্তু শির-দেগা-নেহি-দেগা-আমামার বাণী-দীক্ষিত, জরা-উপেক্ষাকারী বৃদ্ধ নিজাসনে অধিষ্ঠিত, আর নড়লেন না। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদিলীপ দত্ত পিতৃদেবের সাহচর্যে জীবনের পরমার্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আজ আর কারো কাছে অস্পষ্ট অনুমান নয়। বৃদ্ধ এবং তরুণ, বয়ঃক্রমে দুইপ্রান্ত-বাসী একই বিন্দুতে উপনীত। কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় উভয়ে মৃত্যুর বলি হন। বিদেশী

সাংবাদিক, সেনানী-শিবিরের নাপিত ও অন্যান্য জনরব-মারফত শহীদ ধীরেন দত্তের শেষ কটি দিনের কিছু হদিস মেলে। পাকিস্তানী জালেমরা তাঁর চোখ উপড়ে নিয়েছিল, দৈহিক নির্যাতনে হাটু ভেঙে দিয়েছিল। হামাগুড়ি-রত তিনি অশিতমের মোকাবিলা করেছিলেন। হামাগুড়ি-রত শিশু এবং বৃদ্ধ—এখানেও দুই চরম এবং বিপরীতের মিলন।

কাব্যের বিষয়বস্তু সমাক উপলব্ধির জন্যেই কিছু জোরের সঙ্গে স্বল্প পরিসরে দুই অন্ত-দেশের কথা উল্লেখিত। কাব্যের গোটা আবহ একই জ্যা-রেখায় আবদ্ধ।

১৯৭১ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে শহীদ ধীরেন দত্ত পাকিস্তানী নির্যাতন-শিবিরে পার্থিব সম্পর্ক সাঙ্গ করেন। দেশ এবং দশের সঙ্গে চিরদিন একাত্মতার সাধক নিজের আদর্শের কাছে আর যেন বেইমান হতে পারেননি। গণ-কবরেই তো এমন আত্মার চিরশয়ান বা তৎব্যবস্থা ন্যায়সিদ্ধ। পরিবার-পরিজন নয় শুধু, গোটা বাংলাদেশের মানুষের উত্তরাধিকার তাঁর লাশ বেওয়ারিশ ছিল না। তবু লা-হদিস হয়ে গেল সামরিক চামুণ্ডা-দলের বিবেকহীনতার ধাবানলে।

"আইলেস ইন দি আর্ন" রচনার এই পটভূমি বিশদ স্মর্তব্য। আরো স্মর্তব্য, কাব্যের ধ্রুবেদ্যর শ্রীসঞ্জীব শহীদ ধীরেন দত্তের সন্তান। পিতৃপ্রয়াণ এই রচনার অনুপ্রেরণা। এমন অবস্থা কাব্য এবং কবি উভয়ের পক্ষে দুর্বিপাক। শ্রীসঞ্জীব ভূমিকায় প্রথমেই সাফাই ও সতর্কতা পরিবেশন করেছেন :

A postmortem of the incident under study would not possibly pass me for an undertaking based on certain terms of aloofness for its honest performance.

The feeling need be taken apart to freely enter the function of art, to which I may lay no claim. This comes to my direct involvement in the offered subject throwing the issue in conflict with some valid aspects of poetry. Pity harnessed to private end, to name one, would lapse into self-indulgence.

No cover or appeal to arbitrary purgation the wise ancients prescribed, would possibly slave the consequent pretence. To be wise either, for another matter, is not necessarily being truthful. And truth is the firm divide between poetry and pastiche.

এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট্স'-এর মতো এই কাব্যগ্রন্থও শেষ পর্যন্ত উপলক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে চেতনার বহু দূরদূরান্ত পরিব্রজনার সাক্ষী। য়ুরোপীয় ড্রামাটিক অর্কেস্ট্রার অনুসরণে গোটা গ্রন্থ ষোলটি মুভমেন্টে বিভক্ত। তেমনই কায়দায় মুখপাতের আস্থায়ী বার বার ফিরে-ফিরে এসেছে প্রসঙ্গ-পালটের গলি-পথে। এবং সমাপ্তি-প্রান্তে ক্রেস্কারে-ক্রেস্কারে বিবাদী-সম্বাদী নানা সুর-ঝংকারে এক নাদ-সমুদ্রের সংগমে পৌঁছেছে—যেখানে প্রশ্ন এবং জবাব, আদি-অন্তের খোঁট সর্পিল জটিলতায় সমন্বয়রূপে অবশিষ্ট বা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যু কাব্যের প্রেরণা-উৎস, "আইলেস ইন দি আর্ন" গন্তোদ্যীর অগ্র-গতির মতো বিস্তার-পথে সব চুরমার করে বসে। কবির ভাবের অগ্রগতি ভায়োলেন্স্ বা চণ্ডতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে। হ্যামলেটের অনুরূপ শ্রীসঞ্জীব পিতৃপ্রেতচ্ছায়ার অনুপদী। কিন্তু গন্তব্য : চণ্ডতার উৎস-সন্ধান। ভায়োলেন্সের ফলেই তো মৃত্যু। চারণের চোখে পড়ে, আদর্শের সংঘাতই শেষ পর্যন্ত ভায়োলেন্স, যদিও পশ্চাতের তাগিদ যোথ শান্তি-পিয়াসীর স্বর্গ। কবির জবানে—

I've seen man, hating none, incense

Passion bypassing cause. I've heard
His heart beat about the orchard
Of a Mount Olive. However dead
And decayed on pliocene bed
Of rock and rumour, flushed with love.
Of eyes I've lived down and above
Detonation crowned with a child—
Head in the orb, of breasts the filed
Corrugation of wind design
On waters, wild ultramarine
Stir. —পৃষ্ঠা ৪১

নিষ্কলঙ্কতা, শ্রেষ্ঠতা, নিরীহতা প্রভৃতির দোহাই-নাদ উভয় তরফে সমান। তবু ফাঁক থেকে যায়। কবির কণ্ঠস্বরে—

These have no leave, nor they consign
A thing either on either side,
The destroyer and the destroyed
Caught in a tight grip, the gap wide. —পৃষ্ঠা ২৯

ধাঁধার মধ্যে যুগযুগান্তের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সিসিফাসের পন্ডশ্রমের আবার যেন সূত্রপাত। এই গ্রন্থের দশম মুভমেন্ট প্রায় গীতার কাব্যিক অনুবাদ :

And who will draw the line, he said,
Between hands that strike and hands that stay? —পৃষ্ঠা ২৭

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতেম হতম।
উভ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

যিনি ভাবেন আত্মা কাহাকেও বধ করে, যিনি ভাবেন আত্মাকে কেহ বধ করে, তাঁহারা উভয়ে কিছুই জানেন না। —গীতা ২ : ১৮

শ্রীসঞ্জীব এই সাফাই পরিত্যাগ করেন। তার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সমস্যা-এড়ানোর চাতুর্যের স্পর্শহীন। আদর্শের শিকড় যখন বিস্তার-লাভ করে, তখন তার গায়ে কলুষের মাটিটি লাগে এবং ব্যক্তিমানুষ গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার এই প্রশ্নে জোড়াতালি জবাব-প্রদান অনুচিত। আদর্শের বিস্তারে ভায়োলেন্স অবধারিত হয়ে ওঠে। তা ব্যক্তিমানুষকে খর্ব করে এবং সে আদর্শচ্যুত হয়। ভায়োলেন্স বা চন্ডতা ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব চন্ডতা ব্যক্তিত্ব-বিরোধী। একুনে মানবতা-বিরোধী। মুক্তি তথা স্বাধীনতার এই সমস্যা প্রায় গোটা কাব্যের বিষয়বস্তুর নিয়ন্ত্রক। মনোহর রূপকল্পে গড়া সতর্কতার সাইরেন চারণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

The cord be cut, maternal arm
Dying with the olibnum
Fall of threads too fragile to tie
The corpse and cause, for reasons why,
Lest the spoke would seek wheel, lest
The wheel would turn and turn to waste,

Be quiet, dear ghost.

একটি দেহ, একটি আত্মার নিপীড়ন-কেন্দ্রে কাব্যের সূত্রপাত। কিন্তু সমাপ্তি অন্য মেরুপ্রান্তে —যেখানে মানবগোষ্ঠী যৌথভাবে উপস্থিত। প্রথম পনরটি মুভমেন্টে কবি নেপথ্য-কথক মাত্র। ষোড়শ বা শেষ মুভমেন্টে তিনি নিজে ভাষ্যকার এবং মানবিক অস্তিত্বের ট্র্যাজেডিটুকু নিঃশব্দে গ্রীবায় গ্রহণ করেন কাব্যসুধা বিতরণের জন্যে। প্রাচীন শাস্ত্রকার যেন সাক্ষ্য দিতে ছুটে আসে—

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ
সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যতে।
সোঽগ্নিভরৎ সোঽয়মগ্নি পরেণ
মৃত্যুমতিক্রান্তদীপ্যতে॥

তিনি প্রধান ইন্দ্রিয় বাক-কে লইয়া গেলেন। তাহা যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল, তাহা হইল অগ্নিদেবতা। অগ্নি মৃত্যুর অতীত-রূপে দীপ্যমান রহিয়াছে।

—বৃহদারণ্যক : ১ম অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণ

মহৎ কবিতামাত্রেই শেষ পর্যন্ত পার্থিব এবং পরাবিদ্যার যুগপৎ লক্ষণে আক্রান্ত। জগৎ, ঈশ্বর, ব্যক্তি, সমাজ-জীবন—তাদের কাঠামো এবং বুদ্বুদ-আবেষ্টনীর সম্পর্ক-পরিখা পূর্ণ করার দায়িত্ব সকল সৎ কবির। তত্ত্ব এবং কাব্যের ভেদ-রেখা এইভাবে সাতিশয় স্পষ্ট। চারণ-রূপে শ্রীসঞ্জীব সেই ব্রত সম্পর্কে ঘন-সচেতন।

কিন্তু অস্তিত্বের নিপীড়ন ব্যক্তিহিসেবে বিভিন্ন। মননশীল হৃদয়ের যন্ত্রণা ও সাধারণ জীবনযাপনের যন্ত্রণার মধ্যে ফারাক আছে নিশ্চয়। নির্বস্তুক চিন্তারাজ্যে বিচরণশীল মনোপযোগী কাব্যের রূপ তাই স্বতন্ত্র। আধুনিক কাব্য সৃষ্টিশীল এবং ইন্টারপ্রেটেটিভ বা ভাষ্যপ্রাণ মনের ফসল। কাব্য এবং কমেন্টারির মিলন এযুগেই সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কাব্যের গঠনকৌশল, কাঠামোর ভিত স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

শ্রীসঞ্জীবের কাব্যোপচার তার অজস্র প্রমাণ বহন করে। বিষয়বস্তুর জন্যে খড়কুটো আহরণের শ্রম ও সংখ্যা "আইলেস ইন দি আর্ন"-এ বিপুল। টি এস এলিয়ট জন ডান সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছেন যে তাঁর ছিল "mechanism of sensibilities which devours all kind of experiences".

শ্রীসঞ্জীব সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। কাব্যের প্রারম্ভে দেখা যায়, উৎপাটিত চক্ষু এবং আকাশের সমাহার। অনুভূতি-উন্মোচনে গাঁটছড়া বাঁধে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, গ্রহলোকের অদৃশ্য গতিপথ আঁকড়ে। গীতা-বাইবেল-কোরানের পাশাপাশি জড়ো হয় চিকিৎসাশাস্ত্র, অ্যানাটমির উপমা। মধ্য যুগের চার্চ, তার শোকাবহ সংগীতধারা, রানী ময়নামতীর পাহাড় ও মাউন্ট সিনাই, সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ, যীশুখ্রীষ্ট, সমাজতত্ত্বের প্রশ্নবাণ, কোন মহাকবির চকিত প্রতিধ্বনি, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীর রণকৌশল, উদ্ভিদবিদ্যার খড়খড়ি উত্তোলন, গ্রীক দর্শনের গলি—এমনতর তাবৎ পরিশীলনের পরিচয়পত্র যত্রতত্র ছড়ানো। কেবল অন্ধকার অন্তর্লোক আলোকিত করার কাব্যিক উদ্দেশ্যে। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এর চারণ স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের বংশধর নন, বরং মনন-পরিশীলিত বিশ্ববিহারী নাগরিক। চিরাচরিত ধারণায় বাঙালীর হৃদয় ও মনের স্থানিক অস্তিত্ব তাদের বুকে, যেন শির-চ্যুত। কবন্ধ-কবি-সম্প্রদায়-ভুক্ত নন শ্রীসঞ্জীব। বহুৎ দুঃখেই কবি মনোমোহন ঘোষ, যিনি ইংরেজী ভাষায় লিখতেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে জানিয়েছিলেন, "You ask How I like Calcutta. All peopled place are wonderful and this is not least so. I.........long insatiably for some intellectual excitement, to have someone to

talk about poetry with. There are people of course, and plenty of charming enthusiasm, (I have never been among a race so sensitive to poetry) but there is no true understanding of the thing".

এই কাব্যের শেষে কিছু নোট আছে, তা সামান্য। আরো বিস্তারিত নোট থাকা উচিত ছিল সহৃদয় পাঠকের সুবিধার্থে।

শ্রীসঞ্জীব ধ্রুপদী কাঠামো রক্ষার জন্যে সদা যত্নশীল। তাই চিন্তার কুয়াশা ছড়াননি কোথাও। কিন্তু আবেগের কুয়াশা আছে কাব্যের উপাদান এবং অলংকার হিসেবে। সাদামাটা ভাষায়, ব্যঞ্জনার খাতিরে। সুররিয়্যালিস্টদের বিপরীত প্রান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন। নির্জ্ঞান মনের লজিক স্বীকার করে নিলেও চিন্তার লজিক-পরিত্যাগে তাঁর ঘোর আপত্তি। হয়তো ফর্মের প্রতি স্পর্শ-কাতরতা এই প্রবণতার সাফাই-সাক্ষী। সুরারিয়্যালিস্টরা যুগপৎ ক্লাসিসিস্ট হলে যেসব আলো-আঁধারির ক্রীড়া শুরু হতে পারে শ্রীসঞ্জীবের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে বৈকি। কিন্তু কবিকে দুর্বোধ্য অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

এই কাব্যের যাত্রাবিন্দু চর্চিত মনন। তার পরিক্রমা নিছক আবেগের রাজ্যে বসবাস নয়, বরং আবার মননের ফণি-মনসা-কণ্টকিত আচোট-ঊষর জমিনে প্রত্যাবর্তন। কারণে, সেখানেই শুধু মুক্তির আকাশ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি, যদিও এই কবি-সমীপে নিসর্গ বহির্বস্তু—খুব জোর যন্ত্রণার পাশাপাশি বাড়তি সামগ্রীর ভিড়, রোমান্টিকদের বন্দিত মন্ময় সঙ্গী নয়।

গোটা কাব্যে এই প্রক্রিয়া কম-বেশি স্পষ্ট। তাই হয়তো য়ুরোপীয় ড্রামাটিক অর্কেস্ট্রার দিকে গোড়া থেকেই কবির আকর্ষণ—যেখানে বাদী-সম্বাদী সুর, তাল-ফেরতা লয়ের মিশ্রণ শাস্ত্রসিদ্ধ। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এ গীতলতা গায়েব। আবহ অসম্ভব চণ্ডতা-দীর্ণ। গীতলতার ক্ষেত্র কম। তবু লিরিকের আমেজের সুযোগ ছিল। কিন্তু কবির নির্বাচিত রূঢ় শব্দ-সংহতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল। গীতি-কবিতার তুলনা আলতো অধর-চুম্বন, অত্রস্থলে আবেগে দংশন নয়। বিদেশী ভাষার উপর আশ্চর্য দখল থাকা সত্ত্বেও শ্রীসঞ্জীব পাঠককে নরম মাটির কাছে আনেন, তৎক্ষণাৎ সজোরে উর্ধ্বে তুলে পটকান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। নিবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় দুই-একটি নমুনা—

(1) Loaded for a vast beyond

(2) Vexous vision of footlights widowed in the dawn.

রুক্ষতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি এমন পংক্তি যোগ করে বসেন—

Tips as new of a new beginning
Shadows after substance, foams
Throwing flower on the sea's coffin.

কবি লিরিক হাওয়া আনেন কিন্তু তা ভাষায় বা ভাবে আহত, যদিও সকলের জানা—শব্দ বাতাস দিয়ে তৈরি হয়।

চড়া-কড়া শব্দের প্রতি শ্রীসঞ্জীবের মোহ তাঁর আঙ্গিকের অন্তর্গত। মোচড়ের প্রতি এই কবির আকর্ষণ হয়তো বিষয়বস্তুর ধর্মানুযায়ী। পনরটি মুভমেন্ট নানা আবর্তের সাক্ষী। প্রথম সাতটি নিহত এবং হন্তারকদের সম্পর্কের টানাপোড়েন বিবরণ, একক বা দ্বৈতভাবে। অষ্টম মুভমেন্ট হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি। রাষ্ট্রশক্তি, ব্যক্তি, চিত্তবৃত্তি (psyche) এবং যূথ-মানসের সমীকরণ-সন্ধানে তৎপর চারণ-কণ্ঠে অকস্মাৎ অভিশাপের চিৎকার—

And those the invaders did, provision for dead to the dead left,

Taxes for survival. power. Shadows rise and lumber away
Corpses with the rope and coil of siege from a common calvary.
Power. And atrophic in chain, astraddle, all at once
Women between their ravished thighs piss in the captive trench. Power

—পৃষ্ঠা ২৪

আবর্ত-সঙ্কুল নদীর মোহানায় খরস্রোত এবং অসম্ভব গর্জনশীলতায় দীর্ণবিদীর্ণ হয়। সব মুভমেন্টের গন্তব্য ক্রেসেন্ডো-অভিমুখে নিয়ে যাওয়া কম্পোজারের দায়িত্ব। সঞ্জীবের পদ্ধতি তদ্রূপ। কিন্তু আবর্ত আর শেষ হয় না—

Earth-borm, bound to earth and from affiant earth exhumed,
Three-fold contradictions recompensed in a syndrome
Possessing all space and species, a demesne of doom : —পৃষ্ঠা ২৫

অনুসন্ধিৎসার তীব্রতা যন্ত্রণা-প্রশমনের প্রচেষ্টা নয়। বিখ্যাত পোলিশ মঞ্চপরিচালক জর্জি গ্রেটওকি তাঁর আসরে অভিনেতা-গ্রীবা ও যন্ত্রযোগে অসম্ভব উচ্চগ্রামী চিৎকার আর্তনাদ-জাতীয় আদিম শব্দের ব্যবস্থা রাখেন। কারণ, তাঁর মতে, পীড়ক ও নিপীড়িত একে-অপরের আতঙ্কে অস্থির, পরস্পরের প্রতি সমান নিষ্ঠুর, তারা সমানভাবে অপরাধী। আবার সকলেই নিরীহ। রবীন্দ্রনাথের মতো মনুষ্যত্বে অটুট থাকার ফলে হয়তো মঞ্চপরিচালকের অমন সিদ্ধান্ত।

শ্রীসঞ্জীবের জগতে এমন অবরোহপন্থা নেই। তিনি ভায়োলেন্সের স্বরূপ উল্টে-পাল্টে দেখেন। মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠা কেবল আস্থার কাজ নয়। ত্রয়োদশ মুভমেন্ট অন্য প্রতিধ্বনি—

Dare the tensor
Of time stetched taut
Across the waste of space
No shelter might assuage.
Harrow hell, wrack, raze,
Face the foe, avenge,
Father !

নির্জীব নিরীহতা কাম্য নয়। 'ফাদার' এখানে আর্কিটাইপ—মানবগোষ্ঠী। ভায়োলেন্স প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আদর্শের ট্র্যাজিক পরিস্থিতি যেন চোখের আড়াল না হয়। এই চেতনাই মনুষ্যত্বের সড়ক। আলোচ্য কাব্যের প্রচণ্ডতা, আবেগজাত ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা য়ুরোপীয় মাল্‌টিপ্লেয়ার মিউজিকের মতো বহু-মাত্রিক।

কাব্যের আবহ যেহেতু অস্থির চণ্ডতা-দীর্ণ শ্রীসঞ্জীব প্রতিটি মুভমেন্টের গতি অব্যাগত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন মেজাজ-অনুযায়ী নানা ছন্দ-মারফত। কিন্তু প্রায়ই মিল অপেক্ষা অর্ধমিলের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। এবড়ো-খেবড়ো পথে হাঁটার পন্থাও মসৃণ নয়।

ভায়োলেন্স এবং তৎসমস্যা-জর্জরিত কাব্য হিসেবে "আইলেস ইন দি আর্ন" দেশীবিদেশী সকল শ্রেণীর সমঝদারের নিকট সমাদৃত হবে। নিপীড়ন এবং চণ্ডতার প্রতি ঘৃণার এমন সহৃদয় থুৎকার-দানের দৃষ্টান্ত বিরল। তিরিশ সনের দিকে অডেন, ডে লুইস কি এলিয়ট কিছু শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ হেনেই খালাস, সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাননি। ফ্রান্সে পল এলুয়ার অথবা আরাগঁ গালাগালে অভ্যস্ত, অভিশাপ দিতে নয়। তাঁরা দাহ্যমান ম্যান্‌সনের দিকে অসহায় চোখ রেখে ফুৎকার দেন, আগুন নেভানোর কাজে। ম্যানসন যেন নিভন্ত-শিখা কোন প্রদীপ। এদিকে

শ্রীসঞ্জীব পক্ষোপাধ্যায়ের অনন্য পথিক।

এই কাব্য বিদেশী ভাষায় লিখে শ্রীসঞ্জীব আরো মহৎ উপকার সাধন করেছেন। নিউট্রন বোমার ক্যাপসুলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর পক্ষে ভায়োলেন্সের প্রশ্ন এড়িয়ে থাকা আত্মহত্যার সামিল। গোলকী দেহাত আজ প্রত্যেকটি দেশ। প্রচারের দিক থেকে ইংরেজি ভাষার ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, ভাষা এবং ভূগোলের পৌত্তলিকতা বর্তমান বিশ্বে তাড়াতাড়ি দূর হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের সেন্সিবিলিটিজ বা সংবেদন-সপ্তমে পৌঁছুতে না পারলে জাতীয়তাবাদ রীতিমত যুপকাঠ-বিশেষ।

ইংরেজি কবির মাতৃভাষা নয়। এহ বাহ্য। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এর চারণকে শার্লাটান ভাবার কোন অবকাশ নেই। ইংরেজি কাব্যের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। এই কাব্যের আধেয় তার প্রভূত প্রমাণ। রূপকল্প ও ভাবের পারম্পরিক তর্জমা, আটপৌরে সংলাপের ধাঁচ হঠাৎ টেনে আনা, অতীতের আবাহন-বুকে বর্তমানের হাল্কা পেঁচ টেনে কালের যুগপৎ একাত্মতা ও বিচ্ছেদ রচনা—এমনতর নানা টেকনিকের দিক্‌শূল সমঝদারের চোখে সহজেই পড়বে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যের প্রারম্ভ গদ্যে বিরচিত লাজেমী (অবশ্য করণীয়—সুতরাং এখানে পাঠ) ভূমিকার তৃতীয় স্তবক থেকে—যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাঠকের মনশ্চক্ষু ও তত্র-কর্ণপটের জন্যে মাত্র একটি বাক্যে নানা ব্যাপ্তির ছটায়, বিশ্বগ্রাসী প্রচ্ছন্ন বিনম্র একটি কাতরোক্তির বিচ্ছুরণ :—

I submit rather to the dead, blinded and destroyed, by no man perhaps, but by a blind force vicarious on both sides on either end of the otherness, going out of himself on the part of the dead in a lifelong search of freedom without, even unto death, the body freed and far-flung, left perchance by an open ditch, uninvited and never to be found yet, not also to find all that he cherished for a lifetime, the freeing of a people he was not to see before he would realise the release in death by the ditch, contradictions confronting a life passed in prison through the best of years equated no less with a time he found himself in the country's top most post in the cabinet, juxtaposed by the pitch and toss of politics inseparable from a place by the ditch in the end but not for the burial yet, the body never so found, let him enter the poem no matter less than he was in life, in death not to careless a poem begging for no merit except a place between the lines for the burial of the dead.

শওকত ওসমান

বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়—প্রথম খণ্ড। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ৭৩। মূল্য পনর টাকা।

গ্রন্থের নামকরণে অনেক সময় কিছু প্রত্যাশা জাগে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনার প্রতিশ্রুতিবহ তাবৎ সার্থক বইগুলির কথা স্বতই মনে

আসে তুলনার সংকেত নিয়ে। সেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থকারগণ যে সুপরিকল্পিত ধারায় দায়িত্ব পালনে নেমেছিলেন, আমাদের মনোকেন্দ্রের বইটি সেরকম কোন মেথডোলজির নিরিখে লিখিত হয়নি কেন, এই প্রশ্ন প্রতিটি সাহিত্য-সমালোচনাপুস্তকের সজাগ পাঠকের সামনে অপ্রতিরোধ্য। এহেন ত্রুটি লেখক খণ্ডাতে পারতেন একটি ভূমিকায় দু-কথা বলে এবং তাহলে পাঠকের প্রত্যাশাও খর্ব বা অ্যাডজাস্ট করা যেত, আর সূচিপত্র খুলেই প্রথমেই লেখকের যথেচ্ছগামিতার দরুন পাঠকের অনিবার্য শক অনেকখানি অ্যাবসর্ভ হয়ে যেত। কাজে-কাজেই প্রথম নজরে যা মনে হয়—বইটি কিছু সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের অবিন্যস্ত আলোচনার সমষ্টি—তা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে বাধ্য। মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে, গ্রন্থখানিতে কোন সুসমঞ্জস ধারাবাহিকতা ও মুখবন্ধে লিখিত পদ্ধতির পক্ষে কোনরূপ যুক্তির অবতারণা অনুপস্থিত থাকায় বইটির টাইটেলটিই যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছে না পাঠকের প্রাথমিক বিচারেই।

বিশ্বসাহিত্য কথাটি কম স্পর্ধিত ঘোষণা নয়, শব্দটি কম ভারি নয়। আলোচ্য গ্রন্থকারের বিশ্বমানসিত্রে—অবশ্য এই খণ্ডের আলোচনায়—রাশিয়া, ইটালি, গ্রীস, আমেরিকা, ভারত, আরব, স্পেন ইত্যাদি দেশের সাহিত্য অনুপস্থিত। পক্ষে দুটি সাফাই গাওয়া যায়। 'আঙিনা' শব্দটিতে (টাইটেলে) কিছু সবিনয় বিযুক্তিকরণের আভাস হয়তো আছে। তাছাড়া আছে 'ব্লার্বে'র দু-কথা বলার চেষ্টা। শেষোক্ত চেষ্টায় আরো বেশি অভিযোগ অশ্বীয় লেখকের উপরে। 'ব্লার্বে'র কথায় : 'মধ্যযুগ ও আধুনিককালের বারোজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের জীবন ও সাহিত্যের সরস আলোচনা।.....।'

লেখক গ্রন্থটিতে দেশ-কাল-পাত্রের পূর্বসম্মানিত ও গ্রাহ্য কোন বিচারই মেনে চলেননি দেখলে তাঁর উপর পল্লবগ্রাহিতার অভিযোগ আনা স্বাভাবিক নয় কি?

আরো একটা কথা। এইজাতীয় সমালোচনা লেখার একটা সর্বজনস্বীকৃত কনভেনশন রয়েছে। প্রতিটি তমিষ্ঠ লেখক তা পালন করেন। এমনকি মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থও কিছু মূল্যবান সমালোচনাকে আত্মসাৎ করার লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং কখনো-বা লেখক অন্য সমালোচকের নামোল্লেখ করেন বা প্রাসঙ্গিক যুক্তি খণ্ডন করেন। এইসব মূল্যবান গ্রন্থে ঋণ স্বীকৃতির নিদর্শন হিসেবে বা উৎসাহী পাঠকের অধিক পাঠতৃষ্ণা উদ্রেকের বা নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা সমগ্র গ্রন্থের শেষে অথবা পাদটীকায় বিশেষ-বিশেষ গ্রন্থের উল্লেখ বা গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়। কিন্তু এই কনভেনশন এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

'ব্লার্বে'র ঘোষণা অনুযায়ী, আলোচ্য লেখকদের যুগবিবেচনায় দেখা যায় প্রচলিত যুগবিচারের যে সময়সীমার নির্দিষ্ট ধারণা আছে, তা সব একাকার হয়ে যায় পাঠকের সামনে। সার্ভেন্টিস, শেক্সপীয়র, ডিফো, সুইফ্‌ট, জনসন, এমনকি ক্যাম্বেল, হাইন্‌রিখ, হাইনে—কোন্ যুগের লেখক এঁরা? মধ্যযুগের? আধুনিক কালের? কালপরিমাপের কোন্ আচরণবিধি লেখক মেনেছেন, বুঝি না। এই ধরনের অনেক-অনেক অ্যানামালির (না, অ্যানাক্রনিজ্‌মের?) খোলস ছেড়ে শাঁসে পৌঁছাতে হয়।

অবশ্য কিছু ভালোর দিকে কথাও বলা যায়। গ্রন্থকার আলোচ্য লেখকদের জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর ঘটনা সন্নিবেশ করে বইখানিকে উপন্যাসের মতো আস্বাদ্য করে তুলেছেন। তাঁর ভাষা আধুনিকতার চমক ও আড়ম্বরতা থেকে বর্জিত এবং পাঠককে কখনো-কখনো একাগ্র করে তোলার মতো উপকরণে সমৃদ্ধ। না হলে তিনি এমন স্বল্পখ্যাত কবি ক্যাম্বেলকে বেছে নেবেন কেন? আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সুস্থ দেশপ্রেম, পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট এই কবির কাব্যবিষয়ক আলোচনায়। অনেক সেন্টিমেন্টাল পাঠকের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আলোচনাটি। তবে এইজাতীয় ভারত-অনুরাগী বিদেশী লেখক,

কবি আর বক্তাদের অবজেকটিভ আলোচনা যে-কোন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াত অনেক বেশি।

মুরাসাকি, ইভো এবং আন্দ্রিচ ক্যাম্বেলের মতোই স্বল্পখ্যাত। যদিও মুরাসাকি শিকিবুর মতো প্রায় অখ্যাত লেখককে মধ্যযুগ থেকে টেনে এনে আধুনিক পাঠকদের সামনে হাজির করা হয়েছে চিত্তরঞ্জনবাবুর সংবেদনশীল আলোচনায়। কিন্তু জানি না 'গেঞ্জি মনোগাতারি' উপন্যাসখানি কজন উৎসুক পাঠক সংগ্রহ করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও, চিত্তরঞ্জনবাবু লেখিকার আলোচ্য উপন্যাসখানির অনুবাদক বা প্রকাশকের প্রয়োজনীয় তথ্য সংবরণ করে রেখে ঠিক করেননি।

বাকি দশজনের আলোচনায় লেখকের ব্যাপক পঠনপরিচয় বহন করছে। অবশ্য ডিফোর আলোচনাটি অনেক বিতর্কের অবতারণা করতে পারে। সুইফ্‌ট আর জনসন সম্বন্ধে আলোচনা দুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। (যদিও 'রসোত্তীর্ণ' শব্দটি সমালোচনা-গ্রন্থের সমালোচনায় অপ্রযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু 'রার্বে'র ঘোষণায় আছে যে, ".....বারোজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের জীবন ও সাহিত্যের সরস আলোচনা।")। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্বে লেখক আর একটু সাবধানী হবেন, এই আশা রইল।

শিশিরকুমার ভট্টাচার্য

সংগীত-পরিক্রমা—নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭৩। মূল্য আঠারো টাকা।

কাজী নজরুলের গান— নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখার দ্বারা তো দূরের কথা, সংগীতের গূঢ় সংকেত সর্বদা স্বরলিপির সাহায্যেও ঠিক বোঝানো যায় না। তাছাড়া সংগীতের ভালো-মন্দের বিচারও অনেকটাই ব্যক্তিগত রুচি-মর্জি এবং যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে সংগীত-সমালোচকমাত্রই একজন যোগ্য শ্রোতা এবং তাঁর সমালোচনা যুক্তি-পরম্পরায় গ্রথিত। তথাপি তিনি কি অন্য শ্রোতার রুচিতে হানা দিতে পারেন? তদুপরি থেকে যান কিছু অশ্রোতাও যাঁরা সমালোচনা থেকেই মোটামুটি একটা আন্দাজ পেতে চান। একজন সংগীত-সমালোচককে কলম ধরতে গেলে এই ধরনের যাবতীয় সমস্যাকেই মাথায় রাখতে হয়। যেহেতু তিনি কোনো কল্পতরু নন তাই সব তরফের মনোরঞ্জন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যে কোনো সাংগীতিক আলোচনার সূত্রেই সমালোচকের এই সীমাবদ্ধতাটুকু মেনে নেওয়া উচিত।

'সংগীত-পরিক্রমা'-র প্রারম্ভেই শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এ-গ্রন্থে তাঁর উদ্দেশ্য সংগীতশাস্ত্রের মূল সূত্রাবলীর সঙ্গে সাধারণ পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। খুব সাদামাটা ভাষায় সহজ-সরল ভঙ্গিতেই এ-কাজটি তিনি করতে চেয়েছেন। এমন প্রাঞ্জল উপস্থাপনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব যাঁর বিষয়ের ওপর আছে স্বচ্ছ ধারণা এবং ভাষার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কোনো সংগীতশাস্ত্রীর ঔপপত্তিক জ্ঞান তর্কাতীত হলেও লিখনশৈলী অনায়ত্ত থাকায় আলোচনা মাঠে মারা যায়। পক্ষান্তরে ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব না থাকায় অনেকেরই আলোচনা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে ভাসা-ভাসা। শ্রীচৌধুরী

সংগীতশাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত তেমনি একজন সুলেখকও। ফলে তাঁর 'সংগীত-পরিক্রমা' দুই বিরল গুণের সমন্বয়ে অসাধারণ।

উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ গ্রন্থটিতে মোট তেত্রিশটি নিবন্ধ আছে যাদের দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে আছে মার্গসংগীতের আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে কাব্যসংগীতের। কাব্য-সংগীতের আলোচনায় আসতে গিয়ে খুব সংগত কারণেই শ্রীচৌধুরী মার্গসংগীত-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এ যেন মূল সুরে আসার আগে আলাপ।

কিন্তু এ আলাপ যে সর্বদা সুবিন্যস্ত হয়েছে এমন দাবি বোধ হয় সমীচীন নয়। মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী'-তে মার্গ ও দেশীসংগীতের একটি সাংগীতিক সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে যে সংগীতে আলাপ-মূর্ছনা-তান-লয়-অলংকার ইত্যাদি আছে তা হল মার্গসংগীত। দেশীসংগীতে ওসবের বালাই নেই। মার্গসংগীত শিক্ষাসাপেক্ষ, দেশীসংগীত স্বতঃস্ফূর্ত। এই কারণেই একটা জাতির সাংগীতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ জানতে হলে তার দেশীসংগীতকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। 'বাংলার লোকসংগীত' নিবন্ধটি এ-গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। মার্গসংগীতের সাধারণ আলোচনার পরই তার উপস্থাপনা বোধ হয় যথাযোগ্য হত। এবং অতঃপর কীর্তন-প্রসঙ্গ।

কীর্তন-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীচৌধুরী বিক্ষিপ্তভাবে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে আঙ্গিকের দিক থেকে এবং রসবিচারে পালাকীর্তনের সঙ্গে মার্গসংগীতেরই কুটুম্বিতা, আর পদাবলীর সঙ্গে লোকসংগীতের। কীর্তনের অপার ঐশ্বর্য কেবল ভক্তিরসাত্মক গানেই যেন আবদ্ধ না থাকে, তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—সুরকারদের প্রতি এই আবেদন রেখেছেন শ্রীচৌধুরী। বাংলার প্রধান সুরকারেরা কিন্তু সকলেই কীর্তনের সুরকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হাসির গানে রজনীকান্তের কীর্তনাঙ্গের সুর-প্রয়োগ কি সহজে ভোলা যায়? আর রবীন্দ্রনাথ তো শুধু সুরপ্রয়োগেই ক্ষান্ত হননি, কীর্তনের রসে মজে তার অফুরান সম্ভাবনার কথা বার বার বলেছেন। তাঁর সব রসের গানেই কীর্তনের সুর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থের প্রথম অংশে শ্রীচৌধুরী 'আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ' 'সংগীতে তিন পুরুষ', 'কেশরবাঈ কারকার ও হীরাবাঈ বরোদেকার', 'রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী', 'জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী', 'ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী' প্রভৃতি আলোচনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মার্গসংগীতের সবরকম সৌকর্য বজায় রেখেও করিম খাঁ সাহেব যে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তার মধ্যেই শ্রীচৌধুরী খুঁজে পান মার্গসংগীতের সার্বজনীন আবেদন। এই চকিত-মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরাও টের পেয়ে যাই কেন তিনি সংগীতের আলোচনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে চান। সুরসৌন্দর্যের স্বার্থে প্রচল শাস্ত্রীয় অনুশাসন থেকে সরে আসার অসীম সাহস তিনি লক্ষ্য করেন ভীষ্মদেবের গানে। উল্লেখ না করলেও আমাদের বুঝে নিতে দেরি হয় না এই সাহসের পেছনে কাজ করে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বাঙালী ঐতিহ্য।

'হিন্দুস্থানী সংগীতের আরও কি উন্নতি সম্ভব'? এবং 'রাগসংগীতের ভবিষ্যৎ' নামে দুটি নিবন্ধে শ্রীচৌধুরী জানিয়েছেন মার্গসঙ্গীত নাকি উন্নতির চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে গেছে, আর তার উন্নতি সম্ভব নয়। সবিনয়ে জানাই এই নৈতিবাচক উক্তিটি যতোটা দুঃসাহসী ততোটা যুক্তিসহ নয়। একথা ঠিকই অতীতের মতো নিপুণ কলাবন্তের আবির্ভাব এখন আর সচরাচর ঘটে না এবং একথাও অমূলক নয় যে অধুনা শাস্ত্রীয় সংগীতে কিছুটা চর্বিতচর্বণের একঘেয়েমি এসে গেছে। কিন্তু এটাকেই চরম সত্যি বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। নতুন প্রতিভার স্পর্শে এই আপাত-অন্ধকার কেটে যাবে। মার্গসংগীতের সুদীর্ঘ পরিক্রমণ-পথে মাঝে মধ্যেই তো তাকে বিশ্রাম নিতে

হয়েছে। তিন স্বর থেকে সাত স্বর, চোদ্দ শ্রুতি থেকে বাইশ শ্রুতি তো একদিনে সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অংশের প্রারম্ভে চারটি নিবন্ধে শ্রীচৌধুরী রবীন্দ্রসংগীতের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর অনুযোগ, এই গানে শিল্পীর সুরবিহারের স্বাধীনতা নেই (একদা দিলীপকুমারও এই অভিযোগে কবির সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন। অতি-সম্প্রতি অবশ্য তিনি পূর্ব মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।)। শ্রীচৌধুরীর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলির রূপ সংযত, সংহত, গম্ভীর এবং সেইহেতু মনোগ্রাহী। এই মন্তব্যে আপত্তির কারণ দেখি না, কিন্তু তিনি যখন কবির উত্তরজীবনের গানের প্রতি কটাক্ষ করেন (পৃ ৯২) তখন অনেকের মনে হতে পারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনা করেই তো কবি তাঁর উত্তরজীবনের আপাত-সরল গানগুলি বেঁধেছিলেন। প্রথম জীবনের গানে তাঁকে কণ্ঠ করে চিনে নিতে হয়, কিন্তু উত্তরজীবনের গানে তিনি স্বপ্রকাশ। গায়কবিশেষের অক্ষমতার কারণে সংগীত-স্রষ্টাকে দায়ী করা সুবিবেচনার কাজ নয়।

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এতাবৎ যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের মানুষ (দিলীপকুমার এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে বাদ দিয়েই বলছি, কেননা, তাঁদের আলোচনা প্রণালীবদ্ধ নয়) এবং তাঁদের অনেকেরই শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীতেই নিবদ্ধ। ফলে তাঁদের লেখায় সমালোচনার চেয়ে ভক্তিভাবই বেশি প্রকটিত। এক্ষেত্রে শ্রীচৌধুরীর মতো সংগীতজ্ঞের কাছে যে অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছিল তা কিন্তু পূর্ণ হল না।

আর একটি কথা। মার্গসংগীত থেকে সরাসরি রবীন্দ্রসংগীতে এলে মধ্যিখানে বোধ হয় একটা ফাঁক থেকে যায়। আগেই উল্লেখ করেছি সেই ফাঁকে প্রথমে আসতে পারে লোকসংগীতের আলোচনা, তারপর কীর্তনের। কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরাট হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় আসার আগে 'প্রাচীন বাংলা গান' নামে একটি পৃথক নিবন্ধ রাখা যেতে পারে যেখানে দেখানো যাবে মার্গ-সংগীতের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়েই বাঙালী গানে কত স্বকীয়তা দেখাতে পেরেছেন। এ-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি অবশ্যই নিধুবাবু।

নাট্যসংগীতের অশেষ সম্ভাবনার কথা শ্রীচৌধুরী বলেছেন এবং কৃষ্ণধনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও স্মরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতগুলি কি এই অবকাশে আলোচনা করা যেত না?

দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল, দিলীপকুমার, হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, তিমিরবরণ প্রমুখের আলোচনায় শ্রীচৌধুরী গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

মার্গসংগীত, ঘোষসংগীত ইত্যাদির আলোচনা থাকলেও গণ-সংগীত উপেক্ষিত হয়ে রইল কেন? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং অনন্ত প্রথম পর্যায়ের সলিল চৌধুরীর কথা এ-প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে আসে।

'সংগীত-পরিক্রমায় যা নেই তা নিয়ে আক্ষেপের পরিমাণ বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে গেল। আসলে আমাদের হাতের কাছে তো তেমন কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নেই যেখানে আমরা গোড়া থেকে হাল আমল পর্যন্ত সুষ্ঠু সমালোচনা পেতে পারি। 'সংগীত পরিক্রমা' পড়ে মনে হয়েছে আমাদের এতদিনের সেই অভাব বোধ হয় একটু সংস্কারিত হলে এই গ্রন্থটিই মোচন করতে পারে।

'সংগীত-পরিক্রমায় 'কাজী নজরুল ইসলাম—গীতিকার ও সুরকার' নামে একটি নিবন্ধ আছে। 'কাজী নজরুলের গান' গ্রন্থটি সেই নিবন্ধেরই সময়োপযোগী সম্প্রসারণ।

গ্রন্থটি মোট দশটি নিবন্ধের সমষ্টি। শ্রীচৌধুরী এই নিবন্ধগুলিতে নজরুলের কবি-সত্তার সঙ্গে সংগীত-স্রষ্টার যোগ, পূর্বাচার্যদের কাছে তাঁর ঋণ, তাঁর গানের বিচিত্র উপাদান সম্পর্কে নানাবিধ কূটপ্রশ্নের অবতারণা করে গ্রন্থটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

বাংলার কাব্যসংগীতে নজরুলের আগমন রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের পথ ধরেই। গানের সৃষ্টিপ্রাচুর্যে, প্রকরণবৈচিত্র্যে এবং জনপ্রিয়তায় তিনি মনে পড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলের প্রেমের গানের অন্তত একটি পর্যায় কথা ও সুরের হরগৌরী-মিলনে রবীন্দ্র-সংগীতেরই যোগ্য উত্তরসূরী। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ওজোগুণ তিনি নিজের করে নেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে খেয়াল-ভাঙা গানের প্রবর্তন করেন তাকে তিনি আরও এগিয়ে নিয়ে যান। অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন বাংলা গানে ঠুংরির চাল এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য। রজনীকান্তের গানের ভক্তি-আকুলতা প্রকাশ পায় তাঁর ধর্মসংগীতে।

একটু তলিয়ে দেখলে নজরুলকে তাঁর গানে আলাদা করে চিনে নিতেও আমাদের কোনো ভুল হয় না। তাঁর বাংলা গজল, রাগপ্রধান, খেয়াল-ভাঙা গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান, বিদেশী সুরের গান, শ্যামাসংগীত, ইসলামী সংগীত ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে যা দিয়ে অনায়াসেই বোঝা যায় এ-গান নজরুল-গীতি।

অতুলপ্রসাদ দু-একটি বাংলা গজল রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে ছিল নিছক রুচি-বদলের তাগিদে। বাংলা গানে এ-ধারার ব্যাপক প্রচার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় কৃতিত্ব নজরুলের। কাব্যসংগীত রচনার প্রথম পর্বে বাংলা গজল রচনা করে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন চমক। গজল গানের রচনায় এবং পরিবেষণায় একটি বিশেষ রীতি আছে। পারস্য দেশের এই প্রেমসংগীতে দুটি ভাগ—আস্থায়ী এবং অন্তরা। আস্থায়ী অংশ ছন্দোবদ্ধ—মধ্য বা দ্রুত লয়ে গেয়। পরবর্তী অংশ অন্তরা। অন্তরা গাইবার সময় তাল থেকে সরে সুরবন্ধ টানা আবৃত্তি করতে হয়। তারপর আবার আসে আস্থায়ী। গজলে টানা আবৃত্তির অংশগুলিকে শের বলা বলা হয়। শের-সমৃদ্ধ বাংলা গজলের প্রবর্তন করেন নজরুল। এই ধরনের গানে তাঁর আদর্শ ছিলেন পারস্যের মরমী কবি হাফিজ। একটা সময় ফার্সী ভাষার চর্চা বাঙালীর খুব প্রিয় কাজ ছিল। কিন্তু কি অনুবাদে কি স্বাধীন রচনায় বাংলা ভাষায় ফার্সী-চর্চার তেমন নজীর চোখে পড়ে না। নজরুলই বোধ হয় প্রথম সার্থক গীতিকার যিনি বাংলা গজলে সেই কাজটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, অনেক কিছুর মতই এ-কাজটিও অসম্পূর্ণ রেখে তিনি অচিরেই অন্যদিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর পরেও তেমন কেউ এলেন না যিনি এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। নজরুল কি বুঝেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের সুরা ও সাকী বাংলাদেশে খাপ খায় না? নাকি স্বভাব-বৈচিত্র্যেই তাঁর অন্যদিকে বাঁক নেওয়া? এই প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যাবে না।

রাগপ্রধান বাংলা গানে নজরুলের স্বকীয়তা চোখে পড়ার মত। কিন্তু এ-আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রাগপ্রধান আর খেয়াল-ভাঙা গান কাছাকাছি হলেও, এক নয়।

রাগপ্রধান গানে রাগের আমেজ যেমন থাকে তেমনি থাকে কথার কাব্যিকতা। খেয়াল-ভাঙা গানে কথার স্থান প্রায় গৌণ। এবং এই ধরনের গানের মূলে প্রায়শই কোনো হিন্দী গান থাকে যার আদলে এই গান রচিত হয়। রাগপ্রধানে ঠুংরীর চটুল ভঙ্গি, মিশ্র রাগের ছোঁওয়া চলতে পারে, খেয়াল-ভাঙা গানে তা হয় না। রাগপ্রধান এবং খেয়াল-ভাঙা দুই ধরনের গানই রচনা করলেও রাগ-প্রধানে তাঁর পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত। নিঃসন্দেহে এ-ব্যাপারে তাঁর কবি-সত্তা এবং রাগজ্ঞানের পরিচয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। উত্তর ভারতীয় সংগীতের মার্গ ও দেশী উভয় বিভাগ থেকেই তিনি এক্ষেত্রে যথেচ্ছ সাহায্য নিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতীয় এবং লুপ্তপ্রায় অপ্রচলিত রাগের সুর সংগ্রহ করেও তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রীচৌধুরী তাঁর আলোচনায় অসতর্ক-ভাবেই হয়তো 'শূন্যে এ বুকে পাখি মোর' গানটিকে একবার খেয়াল-ভাঙা গান (পৃ ৩৬) আর একবার রাগপ্রধান বলেছেন (পৃ ৬১)। গানটি শুদ্ধ ছায়ানটের দৃষ্টান্ত হলেও (জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের

গাইবার ভঙ্গিও খেয়াল-ঘেঁষা) কাব্যিকতা-গুণে একে রাগপ্রধানই বলা উচিত।

বিদেশী সুরের গান রচনায় নজরুল এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ প্রমুখ সুরকার পাশ্চাত্য সংগীতের সুরকেই তাঁদের গানে প্রয়োগ করেছিলেন। নজরুল আনলেন বাংলা গানে আরবী সুর, মিশরীয় নাচের সুর, মরিশ মেলোডির আমেজ এবং দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপের গান। সংখ্যায় এসব গান বেশি নয়, কিন্তু গুণগত বিচারে খুবই অভিনব। নজরুলের এ-পর্যায়ের গান নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। এ-গ্রন্থে যেটুকু আছে তাতে আশ মেটে না। নজরুলের বিদেশী সুরে রচিত গান নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত।

বাংলা গজল ছাড়াও নজরুলের প্রেমের গানের সংখ্যা খুব কম নয়। প্রেমের সব পর্যায়ের গানই তিনি রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথ কিংবা অতুলপ্রসাদ এবং অংশত দ্বিজেন্দ্রলালও প্রেমের একটি দিকই প্রধান করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের কথা ও সুরে—সেদিকটি হল প্রেমিকের না-পাওয়ার বেদনা। দুঃখভারাক্রান্ত এই প্রেমসংগীতগুলির সঙ্গে নজরুল যোগ করলেন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মিলনের আনন্দ। নীরক্ত প্রেমের গান প্রাণবন্ত হয়ে উঠল নজরুলের হাতে। মনে হয় পটভূমিরূপে এ-ব্যাপারে তাঁর ফার্সী-চর্চা তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাংলার কাব্যসংগীতে নজরুলের প্রেমের গান দীর্ঘদিনের এক অভাব পূরণ করল। শ্রীচৌধুরী প্রাসঙ্গিকভাবে এসব তথ্য ছুঁয়ে গিয়েছেন এবং সেখানেই ক্ষান্ত হননি—খুঁজেছেন সুরকাঠামোয় নজরুলের গানের বৈশিষ্ট্যকে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ প্রমুখের সুরপ্রয়োগের রীতির সঙ্গে নজরুলের সুরপ্রয়োগের রীতির তুলনামূলক আলোচনা করে শ্রীচৌধুরী প্রশংসনীয়ভাবে দেখাতে চেয়েছেন কোথায় নজরুল পূর্ববর্তীদের চেয়ে পৃথক। মনস্বিতার সঙ্গে রসগ্রাহিতার সংযোগে এই আলোচনা অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এরপরও বোধ হয় আর একটি বৈশিষ্ট্য অকথিত থেকে যায়। এটি হল তাঁর গানে বাণী এবং সুরের অপরিমার্জিত সৌন্দর্য। মন্তব্যটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁরা সকলেই সংগীতের বাণীব্যবহারে এবং তার সুরসঞ্চারে অতি-সতর্ক ছিলেন। তাঁদের গান পরিশীলিত, মার্জিত। কিন্তু নজরুল কি কবিতায় কি গানে পরিমার্জনার বড় একটা ধার ধারতেন না। ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। অপরিমার্জনাহেতু তাঁর কবিতায় এবং গানে এক ধরনের টাটকা গন্ধ লেগে থাকে যা সহজেই পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম। ধরা যাক, 'কারার ঐ লৌহকপাট' কিংবা 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' এই দুটি দেশাত্মবোধক গানের কথা। এসব গানের বাণীতে এবং সুরে এমন এক ধরনের জ্বালা আছে যার আবেদন শ্রোতার কাছে সরাসরি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে বাণী ও সুরের অমার্জিত ব্যবহারেই। রবীন্দ্রনাথের কোনো দেশাত্মবোধক গানে কি এ উচ্ছ্বাস কল্পনা করা যায়? দ্বিজেন্দ্রলালও এই নিরাভরণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারতেন কি? শুধু দেশাত্মবোধক গানেই নয়, নজরুলের সব ধরনের গানেই এক স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে যা তাঁর গানকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত। বাণীর সামান্য ত্রুটি ঢেকে গেছে সুরের আবেগ-ঐশ্বর্যে। নজরুলের গানের এই আশিল্পিত সৌন্দর্য নিয়ে গভীর আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন্ জাদুতে তাৎক্ষণিক গানকে তিনি চিরায়ত সম্পদ করে তুলেছেন তা আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারব।

নজরুলের কবিতা নিয়ে অনেক আলোচনা-গ্রন্থ এ-বাংলা ও-বাংলায় বেরিয়েছে কিন্তু গান নিয়ে গ্রন্থ বোধ হয় এই প্রথম। অল্প পরিসরে কবির গানের সমস্ত দিক ছুঁয়ে শ্রীচৌধুরী যে আলোচনার সূত্রপাত করলেন তার জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্য। 'সংগীত-পরিক্রমা'-য় পাঠক হিসেবে যে সামান্য ক্ষোভ ছিল স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই 'কাজী নজরুলের গান'-এ তিনি তা দূর

করে দিয়েছেন। শ্রীচৌধুরীর সংগীত-রুচি ও নজরুলের গান মিলে-মিশে গ্রন্থটিকে অসামান্য সৌন্দর্য দান করেছে।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ—নবনীতা দেব সেন। আশা প্রকাশনী। বারো টাকা।

সমালোচনা-প্রবন্ধে সাধারণত দু ধরনের মনস্কতা আমরা দেখতে পাই। একদল লোক জন-রুচি ও সাহিত্যরসের দিককেই গুরুত্ব দেন। এর জন্যে তাঁরা সাহিত্যপাঠের মানসিক প্রতিক্রিয়ার (অ্যানাটম অব ক্রিটিসিজমে নর্থরোপ ফ্রাই যাকে 'ল্যেন সেন্স' ক্রিটিসিজম বলেছেন) দিকগুলোকে সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্গঠনের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আর, দ্বিতীয় দল শিল্পতত্ত্বের ব্যাকরণভাবনা, তার শিক্ষাগত শৃঙ্খলাকে তাঁদের চিন্তাবিস্তারের ভিটেমৌটি-গেরস্থালির মতো অপরিহার্য বলে মনে করেন। সমালোচনার পাঠক এ হিসেবে দু রকমের। যাঁরা কেবল পাঠকের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকতে চান তাঁরা প্রথম সমালোচকগোষ্ঠীর অনুরক্ত হন। যাঁরা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র, সাহিত্যপাঠ যাঁদের জীবনযাপনের অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তাঁরা দ্বিতীয় দলের ভাবনা-পদ্ধতিতে বেশি আগ্রহ দেখান। 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধে' শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন এই দু ধরনের পাঠকের মনোপযোগী এক মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করেছেন। সাহিত্যের ছাত্রের ধ্যানপ্রয়াস এবং সাধারণ মানুষের উপযোগী এক স্পষ্ট, স্বচ্ছ ভাষা—এ দুটি লক্ষণই তাঁর এই প্রবন্ধ-সংকলনটির বিশেষত্ব। অথচ কোনোরকম পক্ষপাতিত্বের ব্যবধান এখানে নেই। "You will portrary drunkenness, war and love, my goodman, provided you are neither a drunkard, nor a lover, nor a soldier"—ফ্লবেয়ারের এই ঐতিহাসিক উক্তির চরিতার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রীমতী নবনীতা দেব সেনের রচনাপ্রকারে। আবার সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও বিকাশের দিকটি তাঁর মনন-বিস্তৃতির অন্তর্গত। অর্থাৎ শিল্প-মানসিকতায় সম্ভাব্য সমস্ত অন্তর্লীন সুখ ও অসুখের প্রতি মানবিক সহানুভব তাঁকে সমালোচকের কঠোর কঠিন নির্লিপ্তির বাইরে এক শুশ্রূষ কোমলতায় রেখেছে।

যেমন 'প্রবাসী জন্মান্তর' ও 'বিবাগী ফুলের গন্ধ'। বাঙালীর কাছে যে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন জীবনের মর্মমূলে, পশ্চিমে কেন তাঁর আসন চিরস্থায়ী হতে পারল না শেক্সপীয়র, গোটে বা ডস্টয়েভস্কির মতো—তার অনুসন্ধানেই লেখিকার প্রথম প্রবন্ধ (ইংরিজি থেকে অনূদিত), 'প্রবাসী জন্মান্তর'। আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে মার্কিন প্রদেশে বসে লেখা ও সেই দেশেই প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি কিন্তু সে সময়ের (লিখিত ১৯৬১-৬২, প্রকাশিত ১৯৬৬) যখন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা সৌরীন মিত্রের বই এমন কি স্টীফেন হে বা মেরি লেগোর বইও প্রকাশিত হয়নি। একথার উল্লেখ এজন্যেই করছি কেননা এই বইগুলির বিশ্লেষণপদ্ধতির অনেক আগেই যে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী মূল্যায়ন সম্পর্কে এই লেখিকার ভাবনাতত্ত্ব প্রকাশিত, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এ প্রবন্ধে শ্রীমতী দেব সেন রবীন্দ্রনাথের মহৎ মনীষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংকৃত ইংরিজি অনুবাদের দুর্বলতা, একদেশদর্শিতা ও কালজ্ঞানের অভাবকে নির্মোহ ভঙ্গিতে সমালোচনা করেছেন।

'বিবাগী ফুলের গন্ধ' প্রবন্ধটি (শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বইটির সমালোচনা-

প্রবন্ধ) ইয়োরোপপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। প্রেম-বন্ধুত্বে ও শিল্পের অন্তর্দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা-অপূর্ণতাকে আমরা এখানে জানতে সক্ষম হই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক সমাজের অন্তর রূপ, সমকালীন ইয়োরোপের জটিল জীবন এবং রবীন্দ্রব্যক্তিত্বে উপনিবেশিতের জরুরি অন্তর্দ্বন্দ্বি লেখিকার এই প্রবন্ধ দুটিতে স্থান পেয়েছে। অবশ্যই শিল্পসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সমাজচেতনা বা কাল-অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় তার বাইরে অনধিকার অনুপ্রবেশে লেখিকা আগ্রহ দেখাননি।

কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে সমালোচনাগুলিতে (যেমন মালার্মের 'আঁগোয়াস' অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ বা বোদল্যায়ের 'লিমুন্' অনুবাদে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা প্রসঙ্গে) শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন মূল কবিতা ও তার অনুবাদের গঠন-বৈশিষ্ট্য, উপযুক্ত শব্দচয়ন, অর্থসংরক্ষণ, ও আঙ্গিকসৌষ্ঠবের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে দুটি অনুবাদের সংগতি, অসংগতি, ত্রুটি, সাফল্যের প্রতি তার যুক্তিশুদ্ধ মতামত রেখেছেন।

নির্দিষ্ট ধারণার প্রতি কোনোরকম অন্ধ-অনুরাগ (ম্যাথ্যু আর্নল্ডের মতে যার নাম 'টাচ-স্টোন থিয়োরি') নিয়ে তিনি সুধীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেবের পরিমাপ করতে চাননি। মালার্মের স্বচ্ছতা-বোধের (ফরাসী 'ক্লারতে') কতখানি দূরত্বে থেকে গিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং বোদল্যায়ের অনুভূতির তীব্রতাকে বুদ্ধদেবের অনুবাদে শুদ্ধ-চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেই ভিত্তিতেই লেখিকার অনুসন্ধান। মূল ফরাসী কবিতার পাশাপাশি লেখিকা অনূদিত বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়াও ইংরিজিতে অ্যালেন কন্ডার (বোদল্যার) ও রজার ফ্রাই-এর (মালার্মে) অনুবাদ সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্থান পাওয়ায় তুলনামূলক বিচারের একটা নির্ভরযোগ্য আবহাওয়া এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের ইংরিজি ভাষান্তর এবং ভার্জিলের ঈনীডের বাংলা অনুবাদ মত ভাষায় রচিত ক্লাসিক্স অনুবাদের বিশেষ আঙ্গিকের প্রসঙ্গে আলোচনা ছাড়াও, লেখিকা এখানে সাহিত্য ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দেশকাল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতা ও একাত্মতার দিকে একাগ্র মনঃক্ষেপ করেছেন।

'রাজা' ও 'রক্তকরবী'—রবীন্দ্রনাথের এ নাটক দুটির প্রকাশভঙ্গি, প্রতীকব্যবহার, চরিত্র-বিশ্লেষ এবং পরিণতি-ভিন্নতার প্রতি সন্তর্পণ-মনোভাবের মধ্য দিয়েই 'বজ্রগর্ভ কুসুম' প্রবন্ধটিতে শ্রীমতী দেব সেন 'রাজা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটির মৌল ভাবনার সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। শেষ প্রবন্ধ 'ঈশ্বরের প্রতিস্পর্দ্ধী'তেও দুটি উপন্যাসের (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও আলবার্যার কামুর 'প্লেগ') অন্তর-সাদৃশ্য উপস্থাপিত। গবেষকের মনস্কতায় লেখিকা এখানে বাংলার গ্রাম গাওদিয়া এবং আলজিরিয়ার 'ওরান শহরে' একই মৃত্যুশাসনের দূষিত বাতাসকে অনুভব করেন। দুই মুখ্য চরিত্রে যে দুজন ডাক্তার ('প্লেগে'র রিও এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী) তাদের মানসিকতার প্রারম্ভেও সাযুজ্যকে (দুজনেই পেশায় ডাক্তার এবং সমাজ-সচেতন, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁদের দুজনেরই নিয়ত জেহাদ, সে অর্থে তাঁরা দুজনেই 'ঈশ্বরের প্রতিস্পর্দ্ধী') খুঁজে পান তিনি। কিন্তু পরিণতিতে শ্রীমতী দেব সেন রিওর আত্মবোধকে (যা বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শনে সুপুষ্ট) শশীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। লেখিকার মতে বাংলাসাহিত্যে নিতান্ত খাপছাড়া এবং নিঃসঙ্গ নায়ক শশীর মনে জর-পরাজয় সম্পর্কে রিওর মতো দার্শনিক নির্লিপ্তি নেই। তবে উপন্যাস দুটির পটভূমি এবং লোক-জীবনের সঙ্গে উপন্যাস দুটির যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শশীকে রিওর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায়। কেননা রিও ও ওরান

এবং শশী ও গাওদিয়া—মুখ্য চরিত্র ও উপন্যাস-পটভূমির এই দুটি অন্তঃসম্পর্কের তুলনামূলক বিচারে আগ্রহী পাঠক শশীকে রিওর তুলনায় অনেক বেশি প্রাণ নিয়ে, সহানুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছেন। গাওদিয়া শশীর আপনার, ওরান রিওর নিজস্ব নয়, অনেকটা 'আউটসাইডারে'র মারস্যোর মতো রিওর ব্যবহার। হয়তো বা তা আলব্যার কামুর জন্মসমস্যা।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

অঙ্গীকারের কবিতা—ভোল্‌ফ বীয়ারমান। অনুবাদ-ভাষ্য-ভূমিকা-সম্পাদনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অয়ন। কলিকাতা, ৯। মূল্য ছয় টাকা।

পূর্ব জার্মানিতে নিষিদ্ধ একগুচ্ছ কবিতার সংকলন অঙ্গীকারের কবিতা। ভোল্‌ফ বীয়ারমান আমাদের অপরিচিত একটি নাম। কিন্তু তিনি আজকের ইয়োরোপের এক ঝড়-তোলা বিতর্কিত কবি। বিভক্ত জার্মানির দুই অংশেই তাঁর কবিতা-গান নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে।

পূর্ব জার্মানির এই কবি ১৯৭৬ সালে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। আর ১৯৬৩ সালেই তাঁর লেখা ও গান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। গোপন পাঠিকা বা নিষিদ্ধ সংকলন ভিন্ন পূর্বের মানুষেরা বীয়ারমান পড়বার সুযোগ পান না। অগুনতি রেকর্ড থাকলেও তাঁর রেকর্ড ওদেশে বাজানোও নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এই নিষিদ্ধ কবিতাগুলি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ জাগে।

বীয়ারমান পশ্চিম জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত কিন্তু সেখানকার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরূপভাজন। পাস্তেরনাক বা সলঝেনিৎসিনকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে যে তুমুল আলোড়ন হয় সুসংগঠিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে, বীয়ারমান প্রসঙ্গে সেই প্রচারযন্ত্রই পরিকল্পিত নীরবতার দ্বারাই মুছে দিতে চান কবিকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বীয়ারমান জানেন তাঁর কবিতাকে গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে। এই চারণ-কবি, গীতার হাতে নেমে আসেন পথের ভিড়ে, তৈরি করেন এক নতুন জাতের ভিড়—শ্রোতা-পাঠকের এই ভিড়ে কবি মেলে ধরেন তাঁর চিন্তা-ভাবনা-সুখ-দুঃখ-আবেগ-অভিমান এবং অঙ্গীকার আব্‌ত্তিভঙ্গিম সংগীতপদ্যে। সুরেলা লালিত্য, পারিপাট্য নয়, বরং ব্রেশ্‌টের মতোই যুবগোষ্ঠীর জীবন্ত বুলি যা রেস্তোরাঁ-পাবে ব্যবহৃত তাঁর কবিতায়-গানে আনে এক নতুন মেজাজ।

রাজনৈতিক কারণে বীয়ারমানের নিগ্রহ, রাজনৈতিক কারণেই পশ্চিমের বীয়ারমান-প্রসঙ্গে নীরবতা। কিন্তু নিগ্রহ আর নীরবতা খান খান করে ভেঙে দিয়েছে তাঁর কবিতা, তাঁর গান। শিকড়ে শিকড়ে এই কবি কিন্তু ভালোবাসেন গান গাইতে, গান শোনাতে। গান শোনানোতেই, তাঁর আনন্দ।

বীয়ারমান অঙ্গীকারের চারণ-কবি। ১৯৩৬ সালে হামবুর্গের এক কমিউনিস্ট পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৫০ সালে, চোদ্দ বছর বয়সে তিনি প্রথম আসেন পূর্বে, বিশ্ববুবসম্মেলনে যোগ দিতে। এর তিন বছর পরে, ১৭ বছরের উগ্রবগে বিশ্ববাস নিয়ে, তিনি আবার আসেন এখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ এই দশ বছর বীয়ারমানের নিজেকে তিলে তিলে খোঁজার সময়। হমবোল্ট-এ ঢুকলেন পলিটিকাল ইকনমি পড়তে। যোগ দিলেন বার্লিনার আঁসাব্‌ল্-এ। হান্স আইসলারে প্রীতিভাজন হলেন। নাটকের কাজ ছেড়ে আবার শুরু করলেন গণিত ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনা। তার আগে ১৯৫৬ সালে সোবিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেস হয়ে গেছে। স্তালিন

বর্জন পালা শুরু হচ্ছে। বীয়ারমানের বক্তব্য পার্টিতে অগ্রাহ্য হলো। বলা বাহুল্য, পূর্বে এসে তিনি পেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। ১৯৬০, ভিয়', তার থেকে বেশি হাইনে আর ব্রেশ্‌টের আদর্শে শুরু করলেন কবিতা লেখা, সঙ্গে সুরে-সংযোজনা। ১৯৬১ সালে তৈরি হয়ে গেল বার্লিনের সেই পাঁচিল। আরো অসংখ্য সংবেদনশীল জার্মানের মতো বীয়ারমানের স্বপ্ন অবিভক্ত জার্মানি। এই পাঁচিল তাই বীয়ারমানকে আহত করলো। লিখলেন প্রথম নাটক 'বার্লিনের মিলনযাত্রা'। তাঁর কবিতা, গানের বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সরাসরি উপস্থিতিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার বিরক্ত বোধ করলো। প্রকাশক পেলেন না কবি। সমস্ত সাহিত্যপত্রের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাধ্য হয়েই, গীটার নিয়ে নামলেন পথে-ঘাটে-পার্কে-পাবে-রেস্তরাঁয়, ধরলেন গান। ১৯৬৩ সালে তাঁর গান গাওয়া নিষিদ্ধ হলো। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন এই সময়েই। প্রচণ্ড বিরুপতার মধ্যেই প্রথম কবিতার বই 'তারের বীণা' প্রকাশিত হলো ১৯৬৫ সালে, পশ্চিম জার্মানি থেকে। ১৯৬৬ সালে তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হলো। ১৯৬৮ সালে পশ্চিম থেকেই প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মার্কস-এঙ্গেলসের জবানিতেই'। বীয়ারমান মার্কসবাদের নামে পার্টি-আমলা-যথেচ্ছাচার, মার্কসবাদকে অচলায়তনের রূপ দেবার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকার করেছেন। এই কারণেই তিনি পূর্বের বিরাগভাজন। আর ঠিক একই রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কাছে তিনি তখন মূল্যবান হলেন। কিন্তু পশ্চিমের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো যখন প্রকাশিত হলো 'ড্রাগনবধের পালা' নামক অষ্টাঙ্ক গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্যে পশ্চিমের শক্তিলালসা-লোলুপতার বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিলো। 'ড্রাগনবধের পালা' বা 'ডার ড্রা-ড্রা' ১৯৭১ সালে মিউনিকে অভিনীত হলো হাইনার কিপহার্টের পরিচালনায়। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হলো বীয়ারমানের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'জার্মানি : এক শীতার্ত রূপকথা'। ১৯৪৪ সালে হাইনেও লিখেছিলেন একই নামে তৎকালীন শীতার্ত জার্মানির আলেখ্য। বীয়ারমান তাঁর এই আলেখ্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রাকৃতভাষাশ্রয়ী ব্যালাড-স্রষ্টা ও অনিকেত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভিয়' এবং হাইনরিখ হাইনে থেকে। ১৯৭৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে 'ঘুবমাস' উষ্মাপিত হয় নভেম্বরে। এই উপলক্ষে পূর্ব জার্মানির সরকার কবিকে সফরের পাসপোর্ট দেন। কিন্তু ১৩ই নভেম্বরে কোলনে বীয়ারমানের অনুষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম দুই সরকারেরই তৃপ্তি-মসৃণতাকে আঘাত করলো। পূর্ব জার্মানি সরকার ১৬ই নভেম্বরে কেড়ে নিলো বীয়ারমানের নাগরিক অধিকার। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেন কবি।

বীয়ারমানের কবিতা ব্রেশ্‌টের অসন্তোষের ফসল। ব্রেশ্‌ট তাঁর 'ওয়র্ক নোট্‌স'-এ লিখেছেন, 'আদর্শবাদ, আদর্শবাদ আর আদর্শবাদ—কোথাও এতোটুকু নান্দনিকতার নামগন্ধ নেই, গোটা ব্যাপারটা যেন স্বাদহীন খাদ্যের বর্ণনা'। আদর্শবাদের আড়ালে যে আদর্শহীনতার ঢল নেমেছে। হেলমেটহাইস্যেনবুটেল যেমন বলেন সমাজতান্ত্রিক দেশে অনেকেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-এর জন্য বেছে নেন কমিউনিস্ট পার্টিকে। কর্তাভজা হতে পারলে অভাব থাকবে না কিছু। এই মনোভাব থেকে যখন রোথার, গেরলাখ্, গের্ড হাইসের মতো শক্তিশালী কবিও জো-হুজুরপনাতে গা ঢালেন, তখনই অঙ্গীকারবদ্ধ এই চারণ-কবি বলে ওঠেন : সচ্ছলতা চাইনে তা নয়, কিন্তু শেষ প্রহরে/ সচ্ছলতা আমাদেরই হাত যেন না করে/মানুষ শুধু রুটির জন্যে টিকে রয় না ওরে (এটাই হবার কথা, তথাস্তু, পৃ ২৬) পূর্ব জার্মানি যখন বীয়ারমানকে কমিউনিস্ট-বিরোধী বলে প্রচার করছেন, তখন বিক্ষত কবি পার্টির প্রতি বলছেন : ভাই, তুমি ঐ ছুরিটা সরাও/আমার বক্ষ থেকে/বেশ কিছুদিন ধরেই আমার/রক্ত পড়ছে ঝেঁকে (পার্টির প্রতি তিনটি মিনতি, পৃ ২০) এই তিন স্তবকের কবিতায় বীয়ারমান পার্টিকে সম্বোধন করছেন, বোন, ভাই ও মা বলে। আদর্শবাদের দোহাই পেড়ে আমলাতন্ত্রের মুখ-উজ্জ্বল না করতে পারার জন্য কবির ক্ষোভ নেই। কিন্তু ব্রেশ্‌ট

যখন 'উত্তরপুরুষদের প্রতি' জানান আমাদের সময়টা ছিল অন্যরকমের। জুতোর চেয়েও বেশিবার দেশ পাল্টাতে হয়েছে। ফাশিবাদের তাণ্ডব শেষ হবার পর দেশগঠনের পালা এসেছে। তখন অনেক কিছুই সহ্য করেছি দেশগঠনের জন্য। ফলে, সমাজতন্ত্র গঠনের যুগে যেসব সহ্য করেছি, তা যেন পরবর্তীকাল সহ্য না করে।

কিন্তু তোমরা যারা এই বন্যার ভিতর থেকে আসবে
যে-বন্যায় আমরা ডুবে যাচ্ছি

* * *

হায়রে আমরা
যারা ভিত গড়তে চেয়েছি মমতার,
নিজেরাই পারিনি দয়াময়াকে ধরে রাখতে শেষে।

কিন্তু পরে একদিন যখন আসবে
যেদিন মানুষ মানুষকে দিতে পারবে তার হাত,
সেদিন আমাদের বিচার করতে ব'সে
খুব বেশি নির্মম হয়ো না। (উত্তরপুরুষের প্রতি)

ব্রেশ্‌টের আদেশ মেনে নিয়ে চাপা-অভিমানে বীয়ারমান বলেন,

যদি যেতে চাও তোমায় বাধা দেবে কে/আমাদের এই অর্ধ-স্বদেশ থেকে/দেখেছি আমি তো উধাও হওয়া অনেকই/আমি এইখানে পড়ে থাকি প্রাণপণে/যতোক্ষণ না নিথর নখরায়ণে/ঘৃণাহত পাখি ঠুকরে আমায় ছিঁড়ে নেয় আমি দেখি (প্রুশিয়ার ইকারুস, পৃ ৩৬) বা গভীর বেদনার সঙ্গে যখন বলেন : এদেশে আমরা বেঁচে রয়েছি/পরবাসী যেন আপন গেহে (হোল্ডারলীন গীতি, পৃ ৪)

বীয়ারমান ব্রেশ্‌টের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত। ব্রেশ্‌ট যেখানে আপোস করেছেন কালের নির্দেশে, সেই একই নির্দেশে বীয়ারমান সেখানে করেছেন জেহাদ।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বীয়ারমানের কবিতার একটা বড়ো অংশই প্রোপাগান্ডা। এটা অবশ্যই পশ্চিম জার্মানির প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে নিষিক্ত সমালোচকদের মত। বীয়ারমান কবিতায় রাজনীতিকে আনেন বড় সরাসরি বোধ হয় এ-কারণেই এই মতের জন্ম। আর তারজন্য কবি নিজেও কিছুটা দায়ী। তিনি বলেন, চিরন্তনের কবি হবার সাধ নেই তাঁর। তিনি মুহূর্তের কবি হতে চান। অস্থির সমকালের বিবেকের স্বরলিপি তৈরি করেই তৃপ্ত হতে চান। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে বীয়ারমানের কবিতা স্বাদহীন খাদ্যের বর্ণনার প্রতিক্রিয়ায় জন্মেছে। ফলে, কবিতায় গানের অংশ সুপ্রচুর এবং রাজনীতিও হয়ে ওঠে তাঁর কাছে প্রেমিকের কাছে প্রেমের মতোই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভবের তুল্য।

বীয়ারমানের বৈশিষ্ট্য, তাঁর কবিতার চূড়ান্ত সার্থকতা পাঠক-শ্রোতার কানে। গান হয়ে উঠে, তাঁর কবিতা মুহূর্ত পার করে পাড়ি দেয় চিরন্তনের দিকে। অর্থাৎ তিনি জানেন সংগীতের সেই তত্ত্ব ও প্রয়োগকলা, যার সাহায্যে কথার মধ্যেকার নিলীন সংগীতকে, কথা বলার ভঙ্গিতেই শব্দরী রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়। কবিতার এই রিচুয়াল ধর্মে কবির আস্থা ও ক্ষমতার জন্যই বোধ হয় বীয়ারমানকে আজকের জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন হাইনরীজ বোল।

কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে অনেক মত আছে। অলোকরঞ্জন মোটামুটি মানেন মূলের আনুগত্য আর অনুবাদের ভাষার ও ছন্দের স্বকীয়তার দাবি। ৩১টি কবিতা, একটি গীতি-নাট্যের অংশ এবং একটি আলেখ্যকবিতার ৪র্থ সর্গ ও দুটি সর্গের অংশবিশেষ অনুবাদ করে অলোকরঞ্জন

এদেশে অচেনা এক প্রাণময় কবিকে হাজির করেছেন। সঙ্গে রয়েছে গুন্থের গ্লাসের আঁকা দুটি ছবি। বাঁয়ারমানের কবিতার প্রতি কবিতা-প্রেমিক পাঠকের উৎসাহ কতোখানি জাগবে জানি না। কিন্তু সাহিত্যপাঠক রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে এই নিষিদ্ধ কবিতাবলী আকর্ষণীয় হবে।

প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন করতেই হয়, বাঁয়ারমান, যিনি শ্রোতা-পাঠকের কবি, তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে, শুধুই পাঠকের কাছে কতখানি আনন্দের খোরাক দেবে? সুলিখিত ছোট ভূমিকার, বাঁয়ারমানের ছন্দ ও রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার ছিল। 'স্তালিনসরণীর নাম স্তালিনসরণী' হিসেবে টিকিয়ে রাখার পক্ষে আর্টট যুক্তি কবিতা থেকে যদি কেউ অনুমান করেন যে, বাঁয়ারমান স্তালিনপন্থী, তখনই তিনি বিভ্রান্ত হবেন, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির বাঁয়ারমান-প্রীতির সংবাদ শুনে।

গ্যেটে, হাইনে, হোল্ডার্লীন, রিলকে, ব্রেশ্‌টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাঁদের প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু বিতর্কিত এক কবিকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে, তা এখনকার প্রকাশকরাও নিতে ভয় পান না দেখে ভালো লাগল। আশা করা যায় বাঁয়ারমান এদেশেও ঝড় তুলবেন।

ধ্রুব দাশগুপ্ত

ঘাটালের কথা— পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়। ডঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী প্রকাশিত। ঘাটাল। মূল্য কুড়ি টাকা।

'ঘাটালের কথা' মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বিষয়ে লেখা। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও তাঁহার পুত্র প্রণব রায় যৌথভাবে লিখিয়াছেন। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটির চারটি অধ্যায়—দ্বিতীয় (ইতিহাস), তৃতীয় (জনসাধারণ ও জনসমাজ), সপ্তম (পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থান), প্রণব রায়-রচিত। পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় নিজের উদ্যোগে ও আন্তরিক উৎসাহে দীর্ঘকাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করিয়া ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় ইতিহাস রচনার বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল মন্দির ও পুরাকীর্তি সম্বন্ধে। বস্তুত, বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে যে অসংখ্য মন্দির ছড়াইয়া আছে তাহার প্রাথমিক পরিচয় নিরলস উৎসাহে পঞ্চানন রায় মহাশয়ই সংগ্রহ করিতে থাকেন। পরবর্তীকালে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন অনেকেই। মন্দির সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য নিয়া পঞ্চানন রায় 'বাংলার মন্দির' নামে একটি গ্রন্থ এবং 'প্রবাসী'সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'দাসপুরের ইতিহাস' গ্রন্থেও দাসপুর থানার অসংখ্য মন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই কাব্যতীর্থ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বশেষ রচনা 'ঘাটালের কথা' নিয়া আলোচনার আগে কাব্যতীর্থ মহাশয়কে নমস্কার জানাইতেছি।

বিগত পনেরো-কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমাদের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর ঘটিতেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর হইতে ঝোঁকটা সরিয়া আসিতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর। জনজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-গবেষণা করিবার আগ্রহও সৃষ্টি হইয়াছে প্রচুর। সব ক্ষেত্রে সজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টাসম্ভূত না হইলেও

যেসব সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়া আলোচনা-গবেষণার চেষ্টা চলিতেছে, সবই সমাজবিকাশের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। বৃহত্তর সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার এই যে প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, নেতৃত্বের দোষে বিভ্রান্ত না হইলে বা কোন 'বাদে'র প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গতিহীন না হইয়া উঠিলে, এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের ইতিহাস-চর্চায় নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই।

নতুন ধারায় ইতিহাস-চর্চার পথে বাধাও কম নয়। সবচেয়ে বড় বাধা তথ্যের অভাব। এতদিন বেশির ভাগ কাজ হইয়াছে রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়া। তবুও কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞান সীমিত। একটা উদাহরণ ধরা যাক। সপ্তদশ শতকের শেষে বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিং দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী জমিদার ওড়িশার পাঠান-নায়ক রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্ধমানের জমিদারকে পর্যুদস্ত করিয়া ফৌজদারী শাসনকেন্দ্র হুগলীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপ্তি বা সময়ের প্রশ্নে খুব বড় না হইলেও শোভা সিং-এর বিদ্রোহের তীব্রতা কম ছিল না। মুঘল শাসন বিশেষ করিয়া ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বহু ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছিল অথচ মিটাইবার পথ রাখে নাই। বিদ্রোহের মূল কারণ ইহাই। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই কারণে বিদ্রোহ সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বভাবতই শোভা সিংহের বিদ্রোহ নিয়া কতকগুলি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। কয়েকটি প্রশ্নের তাৎপর্য সর্বভারতীয়, কয়েকটি আবার স্থানীয় অবস্থার মধ্যে বিধৃত। দুই ধারার প্রশ্নের উত্তর মিলিলে তবেই শোভা সিংহের বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। মুঘল ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ব্যাপার। চেতুয়া-বরদায় সে ব্যবস্থা কী বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল? স্থানীয় প্রশ্নটা সেখানে প্রধান। চেতুয়া-বরদা ও সন্নিহিত স্থানসমূহে মুঘল শাসন ও ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় সে সবটুকু একত্র করিলে সমস্যার স্থানীয় দিকটি বুঝা যাইত। এইরকমভাবে তথ্যসংগ্রহের সুবেগ 'ঘাটালের কথা'র ইতিহাস-অংশের লেখকের ছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না ভাবিয়া প্রচলিত অজ্ঞতা বা সংস্কারমত বলিয়াছেন শোভা সিংহের বিদ্রোহের কারণ আওরঙ্গজীব কর্তৃক জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।

আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক ভ্রান্তি এবং সংস্কার যে এখনও প্রচলিত আছে স্থানীয় পর্যায়ের বিস্তৃত ইতিহাস না থাকা তাহার অন্যতম কারণ। এককালে কতকগুলি ধারণা নিয়া সাধারণীকরণ হইয়াছিল। ধারণা ঠিক কি ভুল যাচাই করিবার মত পর্যাপ্ত তথ্য নাই, কারণ কোথায় কী ঘটিয়াছিল সে কথা অজ্ঞাত। ফলে আগের ধারণাগুলিই চলিয়া আসিতেছে। ঘাটালের ইতিহাস-লেখকও শোভা সিংহের বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু পুরানো একটা কথা আবৃত্তি করিয়া যান।

শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সম্বন্ধেও এসব কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এখনকার দিনে অনেক প্রশ্নই উঠিতে পারে এবং প্রশ্নের যা ধরন স্থানীয় ইতিহাসে বিস্তৃত জ্ঞান থাকিলে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিতে পারি। সাংস্কৃতিক জীবনে ঘাটাল মহকুমার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। বাংলার বৃহত্তম অংশ নবদ্বীপ-কেন্দ্রিক রঘুনন্দন স্মৃতি-শাসিত। কিন্তু কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় স্মৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ সমাজের বাহিরে স্মৃতিশাসনের স্থানীয় সমাজগুলির মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ অন্যতম প্রধান। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার একটা বড় অংশ এবং সন্নিহিত ঘাটাল মহকুমার আর-একটা অংশ নিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ। নিয়মকানুনের প্রশ্নে রঘুনন্দনকথিত অনুশাসনের সঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের প্রবর্তক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিব্যাখ্যা

অনেকাংশেই পৃথক। পার্থক্য সৃষ্টির একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে, মনে হয়। ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমার শিল্পসমৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সুতী বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, রেশম, চিনি, পিতল-কাঁসার বাসন প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল ব্যাপকভাবে। আবার কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসাও ছিল বিস্তৃত। উত্তর ভারত হইতে পুরী যাইবার প্রশস্ত একটা পথ এই দুইটি মহকুমার মধ্য দিয়াই গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে সাধু-সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রী-দের এই পথে যাওয়া-আসা লাগিয়াই ছিল। আবার রাজনৈতিক প্রশ্নে আরামবাগ ও ঘাটাল দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে প্রত্যন্তভূমি হিসাবে পরিগণিত হইত। সুলতানী ও মুঘল আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এখানে লাগিয়াই ছিল।

একদিকে শিল্প-বাণিজ্যসমৃদ্ধ অর্থনৈতিক জীবন, অন্যদিকে বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ফলে আরামবাগ ও ঘাটালের জনজীবন বাংলার অন্যান্য অংশের একান্ত কৃষি-নির্ভর, অন্তর্মুখী জীবনযাত্রা হইতে পৃথকভাবে গড়িয়া উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই পার্থক্যটাই স্বতন্ত্র খানাকুল-কৃষ্ণনগর স্মৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বস্তুত, আরামবাগ ও ঘাটালের জীবন ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য সুগভীর। উনবিংশ শতকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সর্বপ্রধান হোতা, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংস—তিনজনেরই জন্মস্থান আরামবাগ-ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত উপেক্ষা করিবার নয়।

স্থানীয় ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু করিতেই হইবে এমনও নয়। ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাপক সমাবেশেই স্থানীয় ইতিহাসের সার্থকতা। এই গ্রন্থের জন্য আশীর্বাণী লিখিতে গিয়া ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন, "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচিত না হইলে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে।"

যে কাঠামো নিয়া 'ঘাটালের কথা' লেখা তাহাতে ব্যাপক তথ্য-ভিত্তিক স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রতিশ্রুতি আছে। প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়ই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে তথ্য ও আলোচনা সন্নিবেশিত : দেশপরিচয়, পথ-ঘাট, উৎপন্ন দ্রব্যাদি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিশিষ্ট গ্রাম ও শহর, রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, জাতি ও বৃত্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবার, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার, উৎসব ও অনুষ্ঠান, মেলা, বিদ্যাচর্চা, মঠ-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাকীর্তি। ইহা ছাড়া পরিশিষ্টে ভূমিদান সনন্দ, পাট্টা, ফসল সংক্রান্ত ছাড়পত্র, সালিশ প্রার্থনা-পত্র, শাস্ত্রীয় বিচারের রায় প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলপত্র দেওয়া হইয়াছে। দলিল-পত্রগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বহুবিচিত্র তথ্যের সূত্র।

কাঠামোটি চমৎকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু কাঠামোর মধ্যে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে এবং যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কিন্তু সংশয়ের অবকাশ প্রচুর। তথ্যসম্ভার বহুক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজানও হয় নাই। উপরন্তু ভুল-ভ্রান্তিও অনেক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাধানগর ও ক্ষীরপাই রেসিডেন্সির দলিলপত্র এবং ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেসব একত্র করিলে ঘাটাল মহকুমার সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও রেশম শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। সূত্রগুলি কিন্তু ব্যবহার করা হয় নাই। শিল্প সম্বন্ধে নানা কথা বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু কোথাও কোন শিল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইতেছে না। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘাটাল মহকুমার সমৃদ্ধি রেশম-ভিত্তিক। তুঁতচাষ, রেশম ও রেশমবস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায়ে জনসাধারণের

বিভিন্ন অংশ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটাল মহকুমায় কাহারা তুঁতচাষ করিত, কাহারা নকোদ ও বসনিয়া ছিল, কাহারাই বা দালালি, পাইকারি ও মহাজনি করিত সেসব কথা, তাহাদের পেশা, অর্থনীতি ও সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 'ঘাটালের কথা' পড়িলে জানা যায় না। অথচ একটা মহকুমার মধ্য হইতে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন কাজ কিছু নয়। প্রবীণ বয়সে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের পক্ষে হয়তো নতুন করিয়া মহাফেজখানা হইতে বা নানাস্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করা কঠিনই ছিল, কিন্তু নবীন গ্রন্থকার এই ঘাটতি পূরণ করিয়া দিতে পারিতেন।

ইতিহাস রচনায় ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য সব সময়েই স্পষ্ট থাকা দরকার। স্থানীয় ইতিহাস রচনায় জনশ্রুতির একটা স্থান আছে সত্য, কিন্তু নির্বিচারে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা যে বিপজ্জনক একথা তো বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় দেখিতেছি ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতি এমন-ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে অব্যবসায়ীর পক্ষে পৃথগ্‌ভাবে চিনিয়া নেওয়া কঠিন। অন্যদিকে আবার প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মেদিনীপুর জেলা বাংলায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান। এখানে গণপ্রতিরোধ সংগঠনের প্রধানতম নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গে দেশপ্রাণের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। অথচ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মাতুলালয় ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত—এই সূত্রে তাঁহার সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন মন্দির ও পুরাকীর্তির দীর্ঘ পরিচিতি বইটির একটি অধ্যায় জুড়িয়া আছে। ঘাটাল মহকুমার মন্দির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠালিপি-সংবলিত এবং মন্দিরটি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত সেকথা লিপিতে উল্লিখিত। কোন পুরাবস্তুর সঙ্গে উৎকীর্ণ লিপিতে সময়ের উল্লেখ থাকিলে আলোচনার সময় লিপি-কথিত সময়ের উল্লেখ করাই রীতি। 'ঘাটালের কথা'-য় কিন্তু লিপি-কথিত সময়ের পরিবর্তে মন্দিরটি কত বৎসর আগে নির্মিত সেই কথা বলা হইয়াছে। প্রচলিত রীতি ভঙ্গের সার্থকতা কী সেকথা কিন্তু কোথাও বলা হয় নাই। লেখকের হিসাবে ভুল থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বুঝিবার উপায়ও নাই। অথচ হিসাবে ভুল আছে। উত্তর গোবিন্দপুরে দামোদরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরের লিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল দেওয়া আছে ১২৫২ সাল। 'ঘাটালের কথা' প্রকাশের বৎসর অনুসারে হিসাব করিলে মন্দিরটি ১৩২ বৎসরের পুরাতন। বইতে কিন্তু বলা হইয়াছে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা ১২২ বৎসর আগে। স্বদ্বীপুর গ্রামের রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। কিন্তু লেখক বলিতেছেন ১৫২ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। মন্দিরের সামনে একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ আছে। প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে মঞ্চটি স্থাপিত হয় ১২৩৩ সালে। অর্থাৎ গ্রন্থপ্রকাশের ১৫০ বৎসর পূর্বে মঞ্চটি নির্মিত হইয়াছিল। হইতে পারে রাসমঞ্চের লিপিটিকেই মূল মন্দিরে আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও হিসাবটা স্পষ্টতই ভুল। আর যদি অন্য সূত্র হইতে নির্মাণকাল নির্ধারিত হইয়া থাকে তবে তো তাহার কথা বলা উচিত ছিল।

প্রতিষ্ঠাকালের প্রশ্ন ছাড়াও মন্দিরের আলোচনায় আরও কিছু বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য চোখে পড়ে। রত্নমন্দিরের রত্নগুলি হয় শিখররীতিতে অথবা চালারীতিতে নির্মিত। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, রত্নশিখর বা পিড়ারীতিতে গঠিত (পৃ ২৯৭)। চালা রত্নের উল্লেখ নাই। আবার পিড়া রত্নের কোন দৃষ্টান্তও তিনি দেন নাই। চন্দ্রকোণা বড় অঞ্চলে সম্প্রতি গোলাকৃতি শিখর বসাইয়া একটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। ছবিতে মন্দিরটির পরিচয় লেখা হইয়াছে 'রেখ দেউল রীতির পঞ্চরত্ন।' (২২৫ পৃষ্ঠার সামনে)। মন্দিরটির সঙ্গে রেখস্থাপত্য বা রত্নরীতির কোন সাদৃশ্যই নাই। সমতলছাদবিশিষ্ট দালানমন্দিরকে লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

চাঁদনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে দালানমন্দির বাংলা রীতির স্থাপত্য (পৃ ২১৬)। সমতল ছাদের বাড়ি পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃশ্যমান। ইহার মধ্যে বাংলার নিজস্বতা কোথায়? আবার চালা মন্দিরের আলোচনায় লেখক বলিতেছেন, আটচালার তুলনায় দোচালা, জোড়বাংলা ও চারচালা মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য (পৃ ২১৬)। দোচালা ও জোড়বাংলা সম্বন্ধে কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু চারচালা মন্দির বাংলায় অসংখ্য। বস্তুত, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় চারচালা মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক। নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও রংপুর জেলায় চারচালা মন্দির প্রচুর। ওড়িশার মতো রেখ-মন্দির ঘাটাল মহকুমায় "একটিও নাই বলিলেই চলে" (পৃ ২১৭)। এই মন্তব্যের ঠিক পরেই লেখক রেখরীতিতে নির্মিত ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার রঘুনাথ মন্দিরের উল্লেখ করিতেছেন। রঘুনাথ মন্দির যে রেখমন্দির একথা লেখকের অজানা নয়।

মন্দির প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন "নানা অঞ্চল পরিক্রমা ও সরেজমিনে অনুসন্ধান করিয়া (পৃ ২৩০)। তবুও যে এই ধরনের মারাত্মক ভুল-ত্রুটি লেখার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য না হইয়া পারা যায় না। আশ্চর্য আরও হইতেছি এই কারণে যে, অন্যতম গ্রন্থকার পঞ্চানন রায় মন্দির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'বাংলার মন্দির' ও 'দাসপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এবং 'প্রবাসী' প্রভৃতি নানা পত্রিকায় মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধে ঘাটাল মহকুমার বহু মন্দিরের কথা বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। পঞ্চানন রায় মহাশয়ের রচনায় বিতর্কিত মন্তব্য আছে বটে, কিন্তু তথ্যের ভুল কোথাও চোখে পড়ে না। যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা-লিপি আছে তাহার প্রসঙ্গে তিনি লিপি-কথিত সময়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, কত বৎসর আগে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত সে হিসাব দিবার প্রবণতাও তাঁহার ছিল না। পঞ্চানন রায় মহাশয়ের আগেকার রচনায় যেসব মন্দিরের আলোচনা ও পরিচিতি পাওয়া যায় 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থের স্বাভাবিক কারণেই 'পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থান : মঠ-মন্দির মসজিদ' অধ্যায়ে সেইসব মন্দিরগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের লেখক দ্বিতীয় গ্রন্থকার।

ভুল তথ্য শুধু মন্দির সম্পর্কিত আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজপ্রসঙ্গে জাতি ও বৃত্তির পরিচয়ে দেখিতেছি ধোবা ও স্বর্ণবণিক নবশাখ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর ময়রা তাহার বাহিরে। বাংলার সর্বত্রই কিন্তু অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। পরগনা বিভাগের কথায় লেখক সংবাদ দিতেছেন যে "মুসলমান আমলে ক্ষুদ্রতম সরকারী বিভাগ ছিল পরগনা" (পৃ ৫৩)। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী ও মুঘল আমলে সরকারী নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্রতম এলাকা গঠিত হইত এক বা একাধিক গ্রাম নিয়া। ক্ষুদ্রতম এলাকার নাম মৌজা। অনেকগুলি মৌজা একটি পরগনার অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

ভুল-ত্রুটি বা অসংগতভাবে ব্যবহৃত তথ্যের তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই। কয়েকটির যে উল্লেখ করিয়াছি সে সতর্কতার জন্য। তথ্যের জন্য স্থানীয় ইতিহাসের উপরে অনেকেই নির্ভর করিয়া থাকেন। সীমিত অঞ্চলের বিবরণ সুতরাং লেখক পরিশ্রম করিয়া যথাযথভাবেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এমন একটা বিশ্বাস অনেকেরই থাকে। থাকা অন্যায়ও নয়। ফলে স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য অনেকে অসংকোচে ব্যবহার করেন। স্থানীয় পর্যায়ের সব কথা তো আর সকলের জানা থাকে না তাই তথ্যের যথার্থতা বিচারের অবকাশও তাঁহারা পান না। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের কাঠামোতে যে প্রতিশ্রুতি আছে তাহার প্রভাবে তথ্যসম্ভার সম্পর্কে অনেকে নিঃসংশয় হইবেন, ইহাও বিচিত্র নয়। অন্যদিকে আবার সাধারণ পাঠকের উপর স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাব যথেষ্ট। ইতিহাস সম্পর্কে অনেকের ধারণা সৃষ্টি হয় স্থানীয় ইতিহাস পড়িয়া। ঘাটাল মহকুমার অধিবাসীরা অনেকেই 'ঘাটালের কথা'কে তাঁহাদের মহকুমার ইতিহাস বলিয়া আগ্রহের সঙ্গে পড়িবেন, এবং অনেকে হয়তো ইহাকে তাঁহাদের মহকুমার ইতিহাস বলিয়া স্বীকারও করিয়া নিবেন। নানা বিষয়ে বহু তথ্য গ্রন্থটির

মধ্যে একত্রে পাওয়া যাইবে। উপরন্তু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বয়ং বলিতেছেন, বর্তমান গ্রন্থকার-দ্বয় "এই মহকুমার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প প্রভৃতির (যে) বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক উপকরণের অমূল্য সংগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।" আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ঘাটাল মহকুমা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে।" সাধারণভাবে আগ্রহী পাঠকের স্বভাবতই মনে হইবে 'ঘাটালের কথা'-র মধ্যেই রহিয়াছে ঘাটাল মহকুমার প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং গবেষক ও সাধারণ পাঠক—উভয়ের পক্ষেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। ভুল-ত্রুটি এবং অসংগতির কথাগুলি বলিলাম এই কারণেই।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল